Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

জিহাদ:ইসলাম এবং আধুনিক ভুল ধারনা

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: সাইফুদ্দীন শাকিল

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

রুবি আক্তার

রোলঃ 228021201

২০ মে, ২০২৫ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

জিহাদ:ইসলাম এবং আধুনিক ভুল ধারনা

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওঃ সাইফুদ্দীন শাকিল

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

রুবি আক্তার

রোলঃ 228021201

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, “ জিহাদ:ইসলাম এবং আধুনিক ভুল ধারনা ” বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে রুবি আক্তার, আইডিঃ 228021201 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

____

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: সাইফুদ্দীন শাকিল

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

____

এক্সটারনালঃ

মাও: আলী হাসান

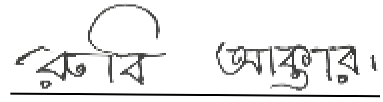
তাজবীদ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, " জিহাদ:ইসলাম এবং আধুনিক ভুল ধারনা " শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মাও: সাইফুদ্দীন শাকিল উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানা মতে ইতিপূর্বে আর কোন ব্যক্তি এই শিরোনামে কোন গবেষণাপত্র রচনা করেননি।



(স্বাক্ষর)

তারিখঃ

২০ মে, ২০২৫ ইং

রুবি আক্তার

আইডিঃ 228021201

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

সূচিপত্র

ভূমিকাঃ

ইসলামের সাথে সাথে ইসলাম বিষয়ক বিভ্রান্তি ও অপপ্রচারের মূলে রয়েছে ‘‘জিহাদ’’।ইসলামকে একটি বর্বর ধর্ম হিসাবে উপস্থাপন করার জন্য ইসলামের শত্রুরা এমনটাই প্রচার করে থাকে। ইসলামে নাকি জিহাদের নামে অন্যায়ভাবে অমুসলিমদেরকে হত্যা করা হয়। তাদের প্রচারণায় অনেক সময় মনে হয় জিহাদের উদ্যেশ্য বুঝি শুধু অমুসলিমদের হত্যা করা আর বিনাশ করা!এমনকি মুসলিম সমাজেও ‘জিহাদ’ শব্দটি প্রায় ট্যাবুতে পরিনত হয়েছে।

অজ্ঞতার কারনে অনেক সময় বলা হয় ভাবা হয় ,ইসলাম ধর্ম জিহাদের মাধ্যমে ফেতনা ফ্যাসাদ এবং অরাজকতা সৃষ্টি করে।ধর্মের নামে রক্তপাত করছে ।নিরবিচারে অসহায় মানুষদের হত্যা করছে।মানুষের উপর ইসলাম জোড় করে চাপিয়ে দিয়ে বর্বর পন্থায় মানব সমাজকে শোষণ করার লক্ষ্যে। কি জঘন্য মিথ্যাচার!! যেন প্রকাশ্য দিবালকে দাঁড়িয়ে সূর্যের আলোর উপস্থিথীকে অস্বীকার করা চেয়েও বড় মিথ্যে।সেই মিথ্যে আবার খুব চাতুরতার সাথে ছড়িয়ে দেয়া হচ্ছে ইতিহাস না জানা অলস অজ্ঞ প্রজন্মের মাঝে।

কোন বিষয় সম্পর্কে প্রকৃত জ্ঞান না রেখে না জেনে সে বিষয়ে মিথ্যে ধারনা লালন করা এবং সেই মিথ্যে অপপ্রচারের উপর ভিত্তি করে। ভ্রান্ত মূল্যবোধের যেই চর্চা হচ্ছে কথিত আধুনিক সমাজে তা খুবই দুঃখজনক বিষয় তো বটেই উপরন্ত পরিবার,শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও সমাজিক পর্যায়ের অভিভাবকদের ইসলামি শরিয়া তথা কুরআন, সুন্নাহে, হাদিসের বিশদ জ্ঞান না থাকা সাথে সাথে প্রজন্মের জ্ঞানবিমুখতা, অলসতা,হলুদ মিডিয়া মিথ্যে প্রচার প্রচারনার উপর বিশ্বাস স্থাপন করার বিরুপ প্রতিফল।

তাই উল্লেখিত শীর্ষক “জিহাদ:ইসলাম এবং আধুনিক ভুলধারনা” বিষয়ক নিম্ন লেখিত গবেষণা পত্র/ থিসিস পেপারের মাধ্যমে প্রথমে জানব ইসলামের শরীয়তের আলোকে প্রথমে জিহাদের পরিচয় ও বিস্তারিত সুস্পষ্ট বর্ণনা এবং পর্যায়ক্রমে প্রাসঙ্গিক বিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছে । নির্দিষ্ট বিষয় বস্তু বোঝার সুবিধার্থে ।

এই গবেষণা/ থিসিসে লেখার উদ্দেশ্য ‘‘জিহাদ:ইসলাম এবং আধুনিক ভুল ধারণা’’ দূরীকরণ এবং এ বিষয়ে পরিস্কার ধারনা তুলে ধরার চেষ্টা করা। যাতে করে অন্তত আমরা জানতে পারি । ইসলামের জিহাদের আসল পরিচয় এবং কথিত আধুনিক সভ্য সমাজে ইসলাম বিদ্বেষী এজেন্ডদের দ্বারা তৈরি করা ভ্রান্ত অযৌক্তিক মতবাদ গুলো কি কি এবং তার বিপক্ষে কুরআন ,হাদিস ও উলামায়ে কেরাম এর লেখনি, বক্তব্য এবং ইতিহাস,বর্তমানের আলোকে যৌক্তিক আলোচনা।

প্রথম অধ্যায়।

জিহাদের পরিচয় ও প্রয়োজনীয়তা এবং গুরুত্ব।

জিহাদের পরিচয়ঃ

জিহাদ (اَلْجِهَاد) আরবি শব্দ। এর আভিধানিক অর্থ প্রচেষ্টা, সংগ্রাম, পরিশ্রম ইত্যাদি। "জিহাদ" শব্দটির একটি সাধারণ অর্থ এবং একটি পারিভাষিক অর্থ রয়েছে। "জিহাদের" সাধারণ অর্থ হল, আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে, শরীয়তের শিক্ষা ও নির্দেশনা অনুযায়ী জান মাল ইলম আমল লেখনী ও বৃক্তৃতার মাধ্যমে সত্য ও ন্যায় প্রতিষ্ঠায় আল্লাহর দীনকে (ইসলামকে) সমুন্নত করাই হল জিহাদ। তা যে কোন পথেই হোক বা যে কোন পন্থায়ই হোক না কেন। অনেকেই জিহাদ বলতে রক্তপাত ও কতল (হত্যা) বোঝেন। এটা সঠিক নয়।

কেননা জিহাদ একটি ব্যাপক অর্থবোধক শব্দ । পৃথিবীর যা কিছু উত্তম তাতেই আল্লাহর সন্তুষ্টি। আর আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যই শুধু জিহাদ হতে পারে।

আল্লাহ পবিত্র কুরআনে বলেনঃ

وَجَا هِدُوْافِى اللهِ حَقَّ جِهَادِهٖ ۜ

অর্থঃ তোমরা আল্লাহর পথে জিহাদ কর যেভাবে জিহাদ করা উচিত। (সূরা আল হাজ্জ আয়াত ৭৮)।

বস্তুত সত্য ও ন্যায়ের পক্ষে এবং অসত্য ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে সব ধরনের চেষ্টা শ্রম ও সাধনাই হল জিহাদ ।

অন্যদিকে "জিহাদ" যা শরীয়তের একটি বিশেষ পরিভাষা, তার অর্থ হল, আল্লাহর কালিমা কে সমুন্নত করা, ইসলাম ও মুসলমানদেরকে রক্ষা করা, মুসলমানদের শক্তি বৃদ্ধি করা ও কাফের মুশরিকদের ক্ষমতা ও কর্তৃত্বকে চূর্ণ করার জন্য আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে কাফের মুশরিকদের সাথে যুদ্ধ করা।

"জিহাদে শরয়ী"র আসল অর্থ তাই। যা সাধারণ অবস্থায় ফরযে কিফায়া এবং বিশেষ অবস্থায় ফরযে 'আইন' হয়ে যায়।

জিহাদ কত প্রকার ও কি কিঃ

জিহাদের প্রকারভেদ:

জিহাদ চার প্রকার।

সেগুলো হচ্ছে:

১- নফসের জিহাদ: নফসের জিহাদ হলো দীন শিক্ষা করে সে অনুযায়ী আমল করে মানুষকে দীনের পথে দাওয়াত দেওয়া এবং এ কাজে কষ্ট-ক্লেশ ও যুলুম নির্যাতন আসলে ধৈর্য ধারণ করা।

২- শয়তানের বিরুদ্ধে জিহাদ: শয়তান বান্দাকে যেসব সন্দেহ-সংশয়, মনের প্রবৃত্তি ও ধোকায় ফেলে সেগুলোর বিরুদ্ধে জিহাদ করা।

৩- কাফির ও মুনাফিকের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা: এ যুদ্ধ অন্তর, ভাষা, সম্পদ ও হাতে তথা শক্তির দ্বারা হয়।

৪- যালিম, বিদ'আতী ও অন্যায়কারীর বিরুদ্ধে জিহাদ: উত্তম জিহাদ হচ্ছে সক্ষম হলে হাত তথা শক্তির দ্বারা প্রতিহত করা। শক্তির দ্বারা সক্ষম না হলে জিহ্বা তথা মুখের ভাষা দ্বারা প্রতিহত করা এবং এতেও অক্ষম হলে অন্তরের দ্বারা জিহাদ করা।

জিহাদ শরী'সম্মত হওয়ার শর্ত :

জিহাদ ইসলামের সর্বোচ্চ শৃঙ্গ এবং সর্বোত্তম নফল ইবাদত। আল্লাহ তা'আলা নিম্নোক্ত অনেক উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে জিহাদ শরী'আতসম্মত করেছেন:

১- আল্লাহর কালেমাকে বুলন্দ করতে এবং দীন পুরোটাই যাতে আল্লাহর জন্য হয়।

২- মানবজাতির সুখ-শান্তি ও তাদেরকে যুলুম-নির্যাতন ও অন্ধকার থেকে উদ্ধার করে আলোর পথে নিয়ে আসতে।

৩- পৃথিবীতে সত্যকে বাস্তবায়ন করে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করতে, বাতিলকে ধ্বংস করতে এবং যুলুম ও ফাসাদকে চিরতরে নিষেধ করতে।

৪- দীনকে প্রচার-প্রসার, মুসলিম উম্মাহকে রক্ষা এবং শত্রুর ষড়যন্ত্রের দাতভাঙ্গা জবাব দিতে ইত্যাদি কারণে আল্লাহ জিহাদ শরী'আতসম্মত করেছেন।

জিহাদ বিধিবদ্ধ হওয়ার গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য কি??

"জিহাদে শরয়ী”র আসল অর্থ পূর্বে আলোচনা উঠে এসেছে যা সাধারন অবস্থায় ফরযে কিফায়া এবং বিশেষ অবস্থায় ফরযে 'আইন' হয়ে যায়।
যখন একদল লোক জিহাদ করবে এবং তারা এ কাজে তারা যথেষ্ট হলে অন্যদের থেকে এ হুকুম রহিত হয়ে যাবে। তবে নিম্নোক্ত অবস্থায় জিহাদ সকলের ওপর ফরয হয়ে যায়:

জিহাদ বিধিবদ্ধ হওয়ার গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্যাবলী নিম্নরূপ:
১. যুগ্ম ও অত্যাচারের প্রতিউত্তর দেওয়া/যুদ্ধের কাতারে চলে আসলে।
২. অত্যাচারিত মুসলমানদের সাহায্য করা/কারও দেশ শত্রু দ্বারা আক্রান্ত হলে।
৩. অঙ্গিকার ভঙ্গের শাস্তি প্রদান করা/ইমাম বা রাষ্ট্রপ্রধান যুদ্ধের জন্য আহ্বান করলে।
৪. ফিত্না-ফাসাদ নির্মূল করা এবং ন্যায় ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠা করা।
৫. কুফরের কর্তৃত্ব নির্মূল করা ও আল্লাহর কালিমাকে বুলন্দ করা।/ইমাম বা রাষ্ট্রপ্রধান যুদ্ধের জন্য আহ্বান করলে।

এ প্রসঙ্গে নিম্নোক্ত আয়াতসমূহ মনোযোগ সহকারে অধ্যয়ন করুন।

১।

اِنَّ اللّٰهَ يُدٰفِعُ عَنِ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ خَوَّانٍ كَفُوْرٍ ﴿۳۸﴾

اُذِنَ لِلَّذِيْنَ يُقٰتَلُوْنَ بِاَنَّهُمْ ظُلِمُوْا ؕ وَ اِنَّ اللّٰهَ عَلٰى نَصْرِهِمْ لَقَدِيْرُ ﴿۳۹﴾

الَّذِيْنَ اُخْرِجُوْا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ اِلَّاۤ اَنْ يَّقُوْلُوْا رَبُّنَا اللّٰهُ ؕ وَ لَوْ لَا دَفْعُ اللّٰهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَّهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَ بِيَعٌ وَّ صَلَوٰتٌ وَّ مَسٰجِدُ يُذْكَرُ فِيْهَا اسْمُ اللّٰهِ كَثِيْرًا ؕ وَ لَيَنْصُرَنَّ اللّٰهُ مَنْ يَّنْصُرُهٗ ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَقَوِيٌّ عَزِيْزٌ ﴿۴۰﴾

اَلَّذِيْنَ اِنْ مَّكَّنّٰهُمْ فِى الْاَرْضِ اَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَ اٰتَوُا الزَّكٰوةَ وَ اَمَرُوْا بِالْمَعْرُوْفِ وَ نَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ ؕ وَ لِلّٰهِ عَاقِبَةُ الْاُمُوْرِ ﴿۴۱﴾

৩৮) নিশ্চয় আল্লাহ মুমিনদেরকে রক্ষা করেন এবং কোন বিশ্বাসঘাতক, অকৃতজ্ঞকে পছন্দ করেন না।

৩৯)যুদ্ধের অনুমতি দেয়া হল তাদেরকে, যাদেরকে আক্রমণ করা হচ্ছে। কারণ তাদের ওপর নির্যাতন করা হয়েছে। নিশ্চয় আল্লাহ তাদেরকে বিজয় দানে সক্ষম।

৪০) তাদেরকে তাদের ঘর-বাড়ি থেকে অন্যায়ভাবে বহিস্কার করা হয়েছে শুধু এ কারণে যে, তারা বলে, আমাদের রব। আল্লাহ। আল্লাহ যদি মানুষদের এক দলকে অন্য দল দ্বারা প্রতিহত না করতেন, তাহলে বিধ্বস্ত হয়ে যেত নাসারা সংসারবিরাগীদের উপাসনাস্থান, গির্জা, ইয়াহূদীদের উপাসনালয় এবং মসজিদসমূহ—যাতে খুব বেশী স্মরণ করা হয় আল্লাহর নাম। আর নিশ্চয় আল্লাহ্ তাকে সাহায্য করেন যে আল্লাহ্কে সাহায্য করে।নিশ্চয় আল্লাহ্ শক্তিমান, পরাক্রমশালী।

৪১) তারা এমন লোক যাদেরকে আমরা যমীনের বুকে প্রতিষ্ঠিত করলে সালাত কায়েম করবে, যাকাত দেবে এবং সৎকাজের নির্দেশ দেবে ও অসৎকাজে নিষেধ করবে; আর সব কাজের চুড়ান্ত পরিণতি আল্লাহর ইখতিয়ারে।
(সুরা হাজ্জ-আয়াতঃ৩৮-৪১)।

২।
فَلْيُقَاتِلْ فِىْ سَبِيْلِ اللهِ الَّذِيْنَ يَشْرُوْنَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا بِالْاٰخِرَةِ ؕ وَ مَنْ يُّقَاتِلْ فِىْ سَبِيْلِ اللهِ فَيُقْتَلْ اَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيْهِ اَجْرًا عَظِيْمًا ﴿۷۴﴾

وَ مَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللهِ وَ الْمُسْتَضْعَفِيْنَ مِنَ الرِّجَالِ وَ النِّسَآءِ وَ الْوِلْدَانِ الَّذِيْنَ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَآ اَخْرِجْنَا مِنْ هٰذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ اَهْلُهَا ۚ وَ اجْعَلْ لَّنَا مِنْ لَّدُنْكَ وَلِيًّا ۚۙ وَّ اجْعَلْ لَّنَا مِنْ لَّدُنْكَ نَصِيْرًا ﴿۷۵﴾

اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا يُقَاتِلُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللهِ ۚ وَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا يُقَاتِلُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ الطَّاغُوْتِ فَقَاتِلُوْٓا اَوْلِيَآءَ الشَّيْطٰنِ ۚ اِنَّ كَيْدَ الشَّيْطٰنِ كَانَ ضَعِيْفًا ﴿۷۶﴾-

৭৪)সুতরাং যারা আখিরাতের বিনিময়ে দুনিয়ার জীবন বিক্রয় করে তারা যেন আল্লাহর রাস্তায় লড়াই করে। আর যে আল্লাহর রাস্তায় লড়াই করবে অতঃপর সে নিহত হোক কিংবা বিজয়ী, অচিরেই আমি তাকে দেব মহা পুরস্কার।

৭৫)আর তোমাদের কী হল যে, তোমরা আল্লাহর রাস্তায় লড়াই করছ না! অথচ দুর্বল পুরুষ, নারী ও শিশুরা বলছে, ‘হে আমাদের রব, আমাদেরকে বের করুন এ জনপদ থেকে যার অধিবাসীরা যালিম এবং আমাদের জন্য আপনার পক্ষ থেকে একজন অভিভাবক নির্ধারণ করুন। আর নির্ধারণ করুন আপনার পক্ষ থেকে একজন সাহায্যকারী।’

৭৬)যারা ঈমান এনেছে তারা লড়াই করে আল্লাহর রাস্তায়, আর যারা কুফরী করেছে তারা লড়াই করে তাগূতের পথে। সুতরাং তোমরা লড়াই কর শয়তানের বন্ধুদের বিরুদ্ধে। নিশ্চয় শয়তানের চক্রান্ত দুর্বল।
(সুরা আন-নিসা,আয়াতঃ৭৪-৭৬)।

সাইখুল ইসলাম হযরত মাওলানা উসমানী (রহ:) বলেন,
দুই কারণে কাফেরদের সাথে যুদ্ধ করা তোমাদের কর্তব্য
এক, আল্লাহর দিন কে সমুন্নত করা।
দুই, কাফেরদের হাতে নির্যাতিত মুসলমানদের মুক্ত করা।

অনেক লোক এমন ছিল রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে হিজরত করতে পারেন নাই তাদের আত্মীয়-স্বজন তাদের ওপর নির্যাতন করার জন্য এবং মক্কার কাফেরদের হাতে নির্যাতিত মুসলমানদের মুক্ত করার জন্য।

৩।
-اَلَا تُقَاتِلُوْنَ قَوْمًا نَّكَثُوْٓا اَيْمَانَهُمْ وَ هَمُّوْا بِاِخْرَاجِ الرَّسُوْلِ وَ هُمْ بَدَءُوْكُمْ اَوَّلَ مَرَّةٍ ؕ اَتَخْشَوْنَهُمْ ۚ فَاللّٰهُ اَحَقُّ اَنْ تَخْشَوْهُ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ﴿۱۳﴾-قَاتِلُوْهُمْ يُعَذِّبْهُمُ اللّٰهُ بِاَيْدِيْكُمْ وَ يُخْزِهِمْ وَ يَنْصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ وَ يَشْفِ صُدُوْرَ قَوْمٍ مُّؤْمِنِيْنَ ﴿ۙ۱۴﴾-وَ يُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوْبِهِمْ ؕ وَ يَتُوْبُ اللّٰهُ عَلٰى مَنْ يَّشَآءُ ؕ وَ اللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ﴿۱۵﴾-اَمْ حَسِبْتُمْ اَنْ تُتْرَكُوْا وَ لَمَّا يَعْلَمِ اللّٰهُ الَّذِيْنَ جٰهَدُوْا مِنْكُمْ وَ لَمْ يَتَّخِذُوْا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَ لَا رَسُوْلِهٖ وَ لَا الْمُؤْمِنِيْنَ وَلِيْجَةً ؕ وَ اللّٰهُ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ﴿۱۶﴾-

তোমরা কি সে সম্প্রদায়ের সাথে যুদ্ধ করবে না, যারা নিজেদের প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেছে এবং রাসূলকে বের করে দেয়ার জন্য সংকল্প করেছে? আর তারাই প্রথম তোমাদের সাথে (যুদ্ধ) আরম্ভ করেছে। তোমরা কি তাদেরকে ভয় কর? আল্লাহ্কে ভয় করাই তোমাদের পক্ষে বেশী সমীচীন যদি তোমরা মুমিন হও।

তোমরা তাদের সাথে যুদ্ধ করবে। তোমাদের হাতে আল্লাহ্ তাদেরকে শাস্তি দেবেন, তাদেরকে অপদস্থ করবেন, তাদের উপর তোমাদেরকে বিজয়ী করবেন এবং মুমিন সম্প্রদায়ের চিত্ত প্রশান্তি করবেন,

আর তিনি তাদের অন্তরের ক্ষোভ দূর করবেন এবং আল্লাহ যাকে ইচ্ছে তার তাওবা কবুল করবেন। আর আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।

তোমরা কি মনে করেছ যে, তোমাদেরকে এমনি ছেড়ে দেয়া হবে অথচ এখনও আল্লাহ প্রকাশ করেননি যে, তোমাদের মধ্যে কারা জিহাদ করেছে এবং কারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ও মুমিনগণ ছাড়া অন্য কাউকেও অন্তরঙ্গ বন্ধুরূপে গ্রহণ করেনি? আর তোমরা যা কর, সে সম্বন্ধে আল্লাহ সবিশেষ অবহিত।
(সুরা তাওবা, আয়াতঃ১৩-১৬)

হযরত উসমানী (রাহঃ) বলেন, জিহাদ বিধিবদ্ধ হওয়ার মূল হিকমত এই যে, পূর্ববর্তী উম্মতের কাফের ব্যক্তিদের ঔদ্ধত্য যখন সীমা অতিক্রম করত তখন আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে ব্যাপক আযাব দিয়ে সমূলে ধ্বংস করে দিতেন কিন্তু এই উম্মতের কাফেরদের জন্য জিহাদ বিধিবদ্ধ হয়েছে। এর মাধ্যমে খোদাদ্রোহী ব্যক্তিদেরকে আল্লাহ তায়ালা তার অনুগত বান্দাদের হাতে শাস্তি প্রদান করেন। এতে একদিকে যেমন কাফেরদের লঞ্ছনা হয় অপরদিকে অল্লাহর অনুগত বান্দাদের মর্যাদা বৃদ্ধি ঘটে এবং তাদের বিজয়ও কর্তৃত্ব প্রকাশিত হয়। এবং মুমিনদের অন্তর এই ভেবে প্রশান্ত হয় যে, গতকাল পর্যন্ত যেসব কাফের তাদের উপর নির্যাতন করত আজ অল্লাহ তা'আলার অনুগ্রহে তারাই তাদের অনুকম্পা বা ইনসাফের মুখাপেক্ষী হয়েছে। অপর দিকে কাফেরদের জন্যও এই শাস্তি বিধানের মধ্যে একটি উপকারী দিক এই রয়েছে যে, এতে করে শাস্তিলাভের পর ও তাদের জন্য তাওবার দরজা খোলা থাকে এবং এ থেকে শিক্ষা গ্রহণের
সুযোগ থাকে। এসব আয়াতে জিহাদ বিধিবদ্ধ হওয়ার আরো একটি হিকমত এই উল্লেখিত হয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলা জিহাদের মাধ্যমে পরীক্ষা করতে চান কারা শুধু মৌখিক বন্দেগীর দাবীদার এবং কারা প্রকৃত পক্ষেই আল্লাহর জন্য জান মাল বিলিয়ে দিতে প্রস্তুত এবং সাথে সাথে
কারা একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যেই নেক আমল করে আল্লাহ পাক তাও জানেন। (তাফসীরে উসমানী, পৃঃ ২৪৪-২৪৫)

৪।

اَلَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَ صَدُّوْا عَنْ سَبِيْلِ اللهِ اَضَلَّ اَعْمَالَهُمْ ﴿١﴾– – فَاِذَا لَقِيْتُمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فَضَرْبَ الرِّقَابِ ۗ حَتّٰۤى اِذَاۤ اَثْخَنْتُمُوْهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ ۙ فَاِمَّا مَنًّاۢ بَعْدُ وَ اِمَّا فِدَآءً حَتّٰى تَضَعَ الْحَرْبُ اَوْزَارَهَا ۛ ذٰلِكَ ۛ وَ لَوْ يَشَآءُ اللهُ لَانْتَصَرَ مِنْهُمْ وَ لٰكِنْ لِّيَبْلُوَاْ بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ ۗ وَ الَّذِيْنَ قُتِلُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللهِ فَلَنْ يُّضِلَّ اَعْمَالَهُمْ ﴿٤﴾سَيَهْدِيْهِمْ وَ يُصْلِحُ بَالَهُمْ ۚ﴿٥﴾وَ يُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ ﴿٦﴾يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اِنْ تَنْصُرُوا اللهَ يَنْصُرْكُمْ وَ يُثَبِّتْ اَقْدَامَكُمْ ﴿٧﴾وَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فَتَعْسًا لَّهُمْ وَ اَضَلَّ اَعْمَالَهُمْ ﴿٨﴾

যারা কুফরী করেছে এবং অন্যকে আল্লাহর পথ থেকে নিবৃত করেছে তিনি তাদের আমলসমূহ ব্যর্থ করে দিয়েছেন(১)।---------

অতএব যখন তোমরা কাফিরদের সাথে মুকাবিলা কর তখন ঘাড়ে আঘাত কর, অবশেষে যখন তোমরা তাদেরকে সম্পূর্ণরূপে পর্যুদস্ত করবে তখন তাদেরকে মজবুতভাবে বাঁধ; তারপর হয় অনুকম্প, নয় মুক্তিপণ। যতক্ষণ না যুদ্ধ এর ভার (অস্ত্র) নামিয়ে না ফেলে। এরূপই, আর আল্লাহ ইচ্ছে করলে তাদের থেকে প্রতিশোধ নিতে পারতেন, কিন্তু তিনি চান তোমাদের একজনকে অন্যের দ্বারা পরীক্ষা করতে। আর যারা আল্লাহর পথে নিহত হয় তিনি কখনো তাদের আমলসমূহ বিনষ্ট হতে দেন না।

অচিরেই তিনি তাদেরকে পথনির্দেশ করবেন এবং তাদের অবস্থা ভাল করে দিবেন।

আর তিনি তাদেরকে প্রবেশ করাবেন জান্নাতে, যার পরিচয় তিনি তাদেরকে জানিয়েছিলেন।

হে মুমিনগণ! যদি তোমরা আল্লাহকে সাহায্য কর, তবে তিনি তোমাদেরকে সাহায্য করবেন এবং তোমাদের পা সমূহ সুদৃঢ় করবেন।

আর যারা কুফরী করেছে তাদের জন্য রয়েছে ধ্বংস এবং তিনি তাদের আমলসমূহ ব্যর্থ করে দিয়েছেন।
(সুরা মুহাম্মাদ,আয়াতঃ১,৪-৮)।

৫।
وَ قَاتِلُوْهُمْ حَتّٰى لَا تَكُوْنَ فِتْنَةٌ وَّ يَكُوْنَ الدِّيْنُ كُلُّهٗ لِلّٰهِ ۚ فَاِنِ انْتَهَوْا فَاِنَّ اللهَ بِمَا يَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ ﴿٣٩﴾ وَ اِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوْۤا اَنَّ اللهَ مَوْلٰىكُمْ ؕ نِعْمَ الْمَوْلٰى وَ نِعْمَ النَّصِيْرُ ﴿٤٠﴾

এবং তোমরা তাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে থাকবে যতক্ষণ না ফেৎনা দূর হয় এবং দ্বীন পূর্ণরূপে আল্লাহর জন্য হয়ে যায়, তারপর যদি তারা বিরত হয় তবে তারা যা করে আল্লাহ তো তার সম্যক দ্রষ্টা।

আর যদি তারা মুখ ফিরায় তবে জেনে রাখ, আল্লাহই তোমাদের অভিভাবক, তিনি কতই না উত্তম অভিভাবক এবং কতই না উত্তম সাহায্যকারী!
(সুরা-আনফাল,আয়াতঃ৩৯-৪০)।

হযরত মাওঃ মুফতী মুহম্মাদ শফী (রহঃ) বলেন, 'দ্বীন অর্থ বিজয় ও কর্তৃত্ব। এই অর্থে আয়াতের তাফসীর এই হবে যে, মুসলমানদের জন্য কাফেরদের সাথে ঐ সময় পর্যন্ত লড়াই জারী রাখা উচিৎ যতক্ষণ না মুসলমানরা তাদের অত্যাচার থেকে নিরাপদ হয়ে যায় এবং দ্বীন ইসলামের বিজয় অর্জিত হয় যাতে সে অন্যদের অত্যাচার থেকে মুসলমানদেরকে রক্ষা করতে সক্ষম হয়।'

তিনি কিছুদূর গিয়ে লিখেন,
'এই তাফসীরের সারকথা হল, মুসলমানদের উপরে ততক্ষণ পর্যন্ত ইসলামের দুশমনদের সাথে জিহাদ ও কিতাল জারী রাখা ওয়াজিব যতক্ষণ না মুসলমানদের উপরে তাদের অত্যাচারের ফিৎনা বন্ধ হয় এবং ইসলাম সকল ধর্মের উপর বিজয়ী হয়। এই অবস্থা ক্বিয়ামতের নিকটবর্তী সময়ে সৃষ্টি হবে তাই জিহাদের বিধানও কিয়ামত পর্যন্ত চলমান থাকবে।'
(মা'আরিফুল কুরআন খ. ৪ পৃ. ২৩৩)

قَاتِلُوا الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِاللهِ وَ لَا بِالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَ لَا يُحَرِّمُوْنَ مَا حَرَّمَ اللهُ وَ رَسُوْلُهٗ وَ لَا يَدِيْنُوْنَ دِيْنَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ حَتّٰى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَّدٍ وَّ هُمْ صٰغِرُوْنَ ﴿٢٩﴾
তোমরা লড়াই কর আহলে কিতাবের সে সব লোকের সাথে যারা আল্লাহ ও শেষ দিবসে ঈমান রাখে না এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূল যা হারাম করেছেন তা হারাম মনে করে না, আর সত্য দীন গ্রহণ করে না, যতক্ষণ না তারা স্বহস্তে নত হয়ে জিযিয়া দেয়। (সুরা তাওবা,আয়াতঃ২৯)।

হযরত উসমানী (রাহঃ) বলেন,
মুশরিকদের বিষয় খতম এবং দেশের অভ্যন্তরীণ পরিস্থিতি কিছুটা শৃঙ্খল হয়ে যাওয়ার নির্দেশ আসল, আহলে কিতাবের শক্তি ও দর্প চূর্ণ কর। মুশরিকদের তো অস্তিত্ব হতেই আরবকে পবিত্র করা উদ্দেশ্য ছিল, কিন্তু ইয়াহুদী নাসারার ক্ষেত্রে তখন পর্যন্ত কেবল এতটুকুই লক্ষ্য ছিল, তারা যাতে ইসলামের বিরুদ্ধে শক্তি নিয়ে দাড়াতে না পারে এবং তার প্রচার-প্রসার ও উন্নতির পথে অন্তরায় হয়ে না থাকে। তাই অনুমতি দেওয়া হয় যে, তারা যদি অধিনস্ত প্রজা

হয়ে জিযইয়া দিতে রাযী থাকে, তবে কোন অসুবিধা নেই প্রজা করে নাও। তারপর ইসলামী সরকারের দায়িত্ব তাদের জান-মালের নিরাপত্তা বিধান করা। পক্ষান্তরে তারা যদি জিযইয়া দিতে সম্মত না হয়, তবে মুশরিকদের অনুরূপ ব্যবস্থা তাদের বিরুদ্ধেও নেওয়া হবে। (অর্থাৎ, জিহাদ ও লড়াই) [তাফসীরে উসমানী (অনুদিত) খণ্ড ২ পৃঃ ১৯১]

জিহাদ ফযর হওয়ার শর্তাবলী:

যখন একদল লোক জিহাদ করবে এবং তারা এ কাজে তারা যথেষ্ট হলে অন্যদের থেকে এ হুকুম রহিত হয়ে যাবে। তবে নিম্নোক্ত অবস্থায় জিহাদ সকলের ওপর ফরয হয়ে যায়।
ইসলাম, আকেল, বালিগ, পুরুষ, অসুস্থতা ও অক্ষমতা থেকে মুক্ত থাকা এবং জিহাদে যাওয়ার খরচ থাকা।
অথচ অনেকেই তা অস্বীকার করে থাকে।
আল্লাহ তা'আলা কুর আনে জিহাদ ফরয করেন যে আয়াতেঃ

كُتِبَ عَلَيۡكُمُ الۡقِتَالُ وَ هُوَ كُرۡهٌ لَّكُمۡ ۚ وَ عَسٰۤی اَنۡ تَكۡرَهُوۡا شَیۡئًا وَّ هُوَ خَیۡرٌ لَّكُمۡ ۚ وَ عَسٰۤی اَنۡ تُحِبُّوۡا شَیۡئًا وَّ هُوَ شَرٌّ لَّكُمۡ ؕ وَ اللّٰهُ یَعۡلَمُ وَ اَنۡتُمۡ لَا تَعۡلَمُوۡنَ ﴿۲۱۶﴾

তোমাদের উপর লড়াইয়ের বিধান দেয়া হয়েছে, অথচ তা তোমাদের কাছে অপছন্দনীয় এবং হতে পারে কোন বিষয় তোমরা অপছন্দ করছ অথচ তা তোমাদের জন্য কল্যাণকর। আর হতে পারে কোন বিষয় তোমরা পছন্দ করছ অথচ তা তোমাদের জন্য অকল্যাণকর। আর আল্লাহ জানেন এবং তোমরা জান না। (সুরা -বাকারাহ,আয়াত-২১৬)

আয়াতের মর্ম হলো, "যদিও জিহাদ স্বাভাবিকভাবে বোঝা বলে মনে হয়, কিন্তু স্মরণ রেখো, মানুষের বিচক্ষণতা, বুদ্ধি-বিবেচনা ও চেষ্টা পরিণামে অনেক সময় অকৃতকার্য হয়। ভালকে মন্দ এবং মন্দকে ভাল মনে করা বিজ্ঞ ও বড় বুদ্ধিমানের পক্ষেও আশ্চর্যের কিছু নয়। প্রতিটি মানুষই তার জীবনের যাবতীয় ঘটনার প্রতি লক্ষ্য করলে বুঝতে পারবে যে, তার জীবনেই অনেক ঘটনা রয়েছে, যাতে সে কোন কাজকে অত্যন্ত লাভজনক ও উপকারী মনে করেছিল, কিন্তু পরিণামে তা অত্যন্ত অনিষ্টকর হয়েছে। অথবা কোন বস্তুকে অত্যন্ত ক্ষতিকর মনে করেছিল এবং তা থেকে দূরে সরে ছিল, কিন্তু পরিণামে দেখা গেল, তা অত্যন্ত লাভজনক ও উপকারী ছিল। তাই বলা হয়েছেঃ জিহাদ যদিও আপাতঃদৃষ্টিতে জান ও মালের ক্ষতির আশংকা মনে হয়, কিন্তু যখন পরিণাম সামনে আসবে, তখন বোঝা যাবে যে, এ ক্ষতি বাস্তবে মোটেও

ক্ষতি ছিল না; বরং সোজাসুজি লাভ, উপকার এবং চিরস্থায়ী শান্তির ব্যবস্থা ছিল।[মাআরিফুল কুরআন]

মন্তব্যঃ আশা করি উক্ত আলোচনায় কুরআন, হাদিসের তথ্যের মাধ্যমে ইসলামি শরীয়া জিহাদের পরিচয় ও প্রয়োজনীয়তা এবং গুরুত্ব সম্পর্কে সঠিক ধারনা নিতে সক্ষম হয়েছি । যা আমাদের গবেষণা পত্র / থিসিস পেপারটির নির্দিষ্ট বিষয়ের গবেষণার প্রতিটি ধাপ সঠিক ভাবে অনুধাবন করতে সাহায্য করবে।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

জিহাদ বিষয়ক কয়েকটি আধুনিক ভুলধারনা/বিভ্রান্তি নিরসন।

১)মুসলিমরা ইসলাম প্রতিষ্ঠার জন্য জিহাদ করে??

মুসলিমরা ধর্মপ্রচার বা ইসলাম প্রতিষ্ঠার জন্য জিহাদ করে ।এটি শুধু জঘন্য মিথ্যাই নয়, বরং প্রকৃত সত্যের সম্পূর্ণ বিপরীত তথ্য। পরবর্তী আলোচনায় আমরা দেখব যে, বাইবেলে ধর্মের কারণে মানুষ হত্যার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। বারংবার বিধর্মীদের উপাসনালয় ভেঙ্গে ফেলার, দেশের বিধর্মী নাগরিকদের উৎসবে ডেকে এনে ঠান্ডা মাথায় হত্যা করার ও নিরিহ বির্ধমীদের ধরে হত্যা করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

৩২৫ খৃস্টাব্দে সম্রাট কনস্টানটাইন খৃস্টধর্মকে রাষ্ট্রধর্মের মর্যাদা দেন। সেদিন থেকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পর্যন্ত খৃস্টান চার্চ, পোপ, প্রচারক ও রাষ্ট্রগুলির ইতিহাস হলো রক্তের ইতিহাস। অধার্মিকতা বা heresy দমনের নামে অথবা ধর্ম প্রচারের নামে পরধর্ম অসহিষ্ণুতা, পরধর্মের প্রতি বিষোদ্গার, জোরপূর্বক ধর্মান্তর, অন্য ধর্মাবলম্বীদের হত্যা, নির্যাতন বা জীবন্ত অগ্নিদগ্ধ করা খৃস্টান ধর্মের সুপরিচিত ইতিহাস।

___ বাইবেল, ১ রাজাবলি ১৮/৪০; ২ রাজাবলি ১০/১৮-২৮।

পক্ষান্তরে ইসলামে শুধু রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্ব ও নিরাপত্তার জন্যই যুদ্ধ বৈধ করা হয়েছে, ধর্ম প্রচারের জন্য নয়। ইসলামে যুদ্ধের ময়দান ছাড়া কখনোই অমুসলিম হওয়ার কারণে কাউকে হত্যা করা হয় নি বা জোরপূর্বক মুসলিম বানানো হয় নি। রাসূলুল্লাহ (ﷺ)- এর মদীনায় আগমনের পূর্বে তথাকার অনেকের সন্তান ইহূদী ধর্ম গ্রহণ করেছিল। এরা ইসলাম গ্রহণের পরে তাদের সন্তানদেরকে ইসলাম গ্রহণের জন্য চাপ প্রয়োগের সিদ্ধান্ত নেন। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) তাদেরকে এরূপ চাপ প্রয়োগ থেকে নিষেধ করেন এবং তাদেরকে তাদের পছন্দের ধর্ম পালনের অধিকার প্রদান করেন।

____(আবু দাউদ, আস-সুনান (কিতাবুল জিহাদ, বাবুল আসীর ইউকরাহু) ৩/৫৮। হাদিসটি সহীহ।

মন্তব্যঃ মুসলিমরা যদি ইসলাম প্রতিষ্ঠার জন্যই জিহাদ করতো তাহলে যুদ্ধের ময়দান ছাড়া অমুসলিম হত্যা করা হতো। নবিজি রাসূলুল্লাহ (ﷺ)- এর মদীনায় আগমনের পূর্বে তথাকার অনেকের সন্তান ইহূদী ধর্ম গ্রহণ করেছিল। এরা ইসলাম গ্রহণের পরে তাদের সন্তানদেরকে ইসলাম গ্রহণের জন্য যখন চাপ প্রয়োগের সিদ্ধান্ত নিয়েছিল তখন রাসূলুল্লাহ (ﷺ) তাদেরকে এরূপ চাপ প্রয়োগ থেকে নিষেধ করতেন না।

২)ইসলাম কি অন্যায়ভাবে অমুসলিমদের হত্যার বৈধতা দেয়??

বিধর্মীকে হত্যা তো দূরের কথা, বিধর্মীর সাথে অভদ্র আচরণ করতেও নিষেধ করা হয়েছে। তাদের ধর্মবিশ্বাস বা উপাস্যদেরকে গালি দিতে নিষেধ করা হয়েছে। মুসলিম তাঁর নিজের বিশ্বাসের শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনা করবেন, তবে কারো গালি দিবেন না বা কারো অনুভূতি আহত করবেন না। কারণ এতে পারস্পারিক গালাগালিই বাড়বে। প্রত্যেকেই তো তার ধর্মকে ভালবাসে। আল্লাহ মানব প্রকৃতি এভাবেই সৃষ্টি করেছেন। আর কারো ভক্তি ও ভালবাসা আহত করার মধ্যে কোনো কল্যাণ নেই।

মহান আল্লাহ বলেন:
لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ
"দীনে কোনো জবরদস্তি নেই। ভ্রান্তি থেকে সত্য সুস্পষ্ট হয়েছে। যে তাগূতকে অবিশ্বাস করবে এবং আল্লাহকে বিশ্বাস
করবে সে এমন এক মযবুত হাতল ধরবে যা কখনো ভাঙ্গবে না। আল্লাহ সর্বশ্রোতা প্রজ্ঞাময়।" (সূরা বাকারা। ২৫৬ আয়াত।)

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَٰلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ
"আল্লাহকে ছেড়ে যাদেরকে তারা ডাকে তাদেরকে তোমরা গালি দিও না; কারণ এতে তারাও সীমালঙ্ঘন করে অজ্ঞতাবশত আল্লাহকে গালি দিবে। এভাবেই আমি প্রত্যেক জাতির দৃষ্টিতে তাদের কার্যকলাপ সুশোভন করেছি; অতঃপর তাদের প্রতিপালকের নিকট তাদের প্রত্যাবর্তন, তখন তিনি তাদেরকে তাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে অবহিত করবেন।"
সূরা ৬: আন'আম, ১০৮ আয়াত।

অন্যত্র মহান আল্লাহ বলেন:

وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ

"তোমরা উত্তম পন্থায় ছাড়া অন্যান্য ধর্মগ্রন্থের অনুসারীদের সাথে বিতর্ক করবে না, তবে তাদের মধ্যে যারা সীমালঙ্ঘন করেছে তারা ব্যতিক্রম।"সূরা ২৯: আনকাবুত, ৪৬ আয়াত।

হাদিসে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন:

من قتل نفسًا معاهدًا لم يَرَحْ رائحةَ الجنةِ ، وإنَّ رِيحَها ليُوجدُ من مسيرةِ أربعين عامًا

"যদি কোনো ব্যক্তি মুসলিম রাষ্ট্রের মধ্যে বসবাসকারী অমুসলিম নাগরিক বা মুসলিম দেশে অবস্থানকারী অমুসলিম দেশের কোনো অমুসলিম নাগরিককে হত্যা করে তবে সে জান্নাতের সুগন্ধও লাভ করতে পারবে না, যদিও জান্নাতের সুগন্ধ ৪০ বৎসরের দুরত্ব থেকে লাভ করা যায়।" বুখারী, আস-সহীহ ৩/১১৫৫, ৬/২৫৩৩; মুসলিম, আস-সহীহ ৪/২২৭৮।

জুইশ এনসাইক্লোপিডীয়া, অন্যান্য বিশ্বকোষ ও ইতিহাস প্রমাণ করে যে, বিগত দেড় হাজার বছরে ইউরোপের সকল খৃস্টান দেশে ইহূদীদের উপর বর্বর অত্যাচার করা হয়েছে, জোর পূর্বক তাদের ধর্মান্তরিত করা হয়েছে, তাদেরকে গণহারে হত্যা করা হয়েছে, তাদেরকে গণ-আত্মহত্যায় বাধ্য করা হয়েছে এবং নানভাবে তাদের সম্পদ ছিনিয়ে নেওয়া হয়েছে। অথচ এ সময়ে মুসলিম দেশগুলিতে ইহূদীরা পরিপূর্ণ ধর্মীয় স্বাধীনতা ও নাগরিক অধিকার নিয়ে বসবাস করেছেন।

প্রায় দেড় হাজার বৎসর ধরে মুসলিমগণ আরববিশ্ব শাসন করেছেন। সেখানে দেড় কোটিরও বেশি খৃস্টান ও কয়েক লক্ষ ইহূদী এখন পর্যন্ত বংশপরম্পরায় বসবাস করছে। ভারতে মুসলিমগণ প্রায় একহাজার বছর শাসন করেছেন, সেখানে প্রায় শতকরা ৮০ জন হিন্দু। অথচ খৃস্টানগণ যে দেশই দখল করেছেন, জোরযবরদস্তি করে বা ছলে-বলে সেদেশের মানুষদের ধর্মান্তরিত করেছেন অথবা হত্যা ও বিতাড়ন করেছেন।

মন্তব্যঃ অন্যায়ভাবে অমুসলিমদের হত্যা করা যে ইসলামে সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ উপরে উল্লেখিত ইসলামি শরিয়া তথা কুরআন ,হাদিস এর মাধ্যমে তা সুস্পষ্ট ।

যদি মুসলিমরা অন্যায়ভাবে অমুসলিমদের হত্যাই করতো।মুসলিম দেশগুলিতে দেড় কোটিরও বেশি খৃস্টান ও কয়েক লক্ষ ইহূদী এখন পর্যন্ত বংশপরম্পরায় সেখানে বসবাস করতে পারতনা। ভারতে মুসলিমগণ প্রায় একহাজার বছর শাসন করেছেন, সেখানে প্রায় শতকরা ৮০ জন হিন্দু শান্তিতে বসবাস করেছে কেমন করে!অন্যদিকে ইহুদিরা ইউরোপীয় নিপীড়ন থেকে বাঁচার জন্য।১৯০০ সালের শুরু থেকেই ।ব্রিটিশ ম্যান্ডেটের অধীনে (১৯১৭-১৯৪৮),

কিছুটা ব্রিটিশ সহায়তায় ইহুদি অভিবাসন বাড়তে থাকে।“১৯৪০ সালে তারা মুসলিম দেশ ফিলিস্তিনে এসে আশ্রয় নেয়”।

৩)ইসলাম কি জিহাদের মাধ্যমে পছন্দমত ধর্ম পালনে বাধা প্রদান করে??

যারা এমন কথা বলে বিশ্বাস করে তারা   তাদের জ্ঞানহীন আকলের অজ্ঞতার পরিচয় দেয় বৈ কিছু নয়। ইসলাম কখনো কাউকে পছন্দ মত ধর্ম পালনে বাধা প্রদান করে না । পৃথিবীর সূচনা থেকেই মানুষ নানা পথ ও মতে চলছে। তাই মানুষের মধ্যকার এই বিরোধ ও বৈপরীত্য রোধ করা সম্ভব নয়। এই বিরোধের চূড়ান্ত মীমাংসা হবে পরকালে। তাই দুনিয়ার জীবনে যথাসম্ভব সহাবস্থানের বিকল্প নেই।

মানুষের মধ্যকার বিরোধ অবধারিত হলেও সব ধর্ম ও মতাদর্শের মানুষ ধর্মীয় উপাসনালয়গুলোকে শ্রদ্ধার চোখে দেখে এবং কোনো উপাসনালয়ে হামলা কিংবা বাধা প্রদান করা যেকোনো আইনের চোখে অপরাধ। শান্তির ধর্ম ইসলাম এ বিষয়ে সর্বাধিক সতর্ক থাকার নির্দেশ দিয়েছে। প্রয়োজনে অন্য ধর্মের উপাসনালয় রক্ষায় যুদ্ধ করার নির্দেশ দিয়েছে।

এ বিষয়ে কোরআনের আল্লাহ বলেনঃ

الَّذِيۡنَ اُخۡرِجُوۡا مِنۡ دِيَارِهِمۡ بِغَيۡرِ حَقٍّ اِلَّاۤ اَنۡ يَّقُوۡلُوۡا رَبُّنَا اللّٰهُ ؕ وَ لَوۡ لَا دَفۡعُ اللّٰهِ النَّاسَ بَعۡضَهُمۡ بِبَعۡضٍ لَّهُدِّمَتۡ صَوَامِعُ وَ بِيَعٌ وَّ صَلَوٰتٌ وَّ مَسٰجِدُ يُذۡكَرُ فِيۡهَا اسۡمُ اللّٰهِ كَثِيۡرًا ؕ وَ لَيَنۡصُرَنَّ اللّٰهُ مَنۡ يَّنۡصُرُهٗ ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَقَوِىٌّ عَزِيۡزٌ ﴿۴۰﴾

.আল্লাহ যদি মানবজাতির এক দলকে অন্য দল দ্বারা প্রতিহত না করতেন, তাহলে বিধ্বস্ত হয়ে যেত খ্রিস্টান সংসারবিরাগীদের উপাসনাস্থল, গির্জা, ইহুদিদের উপাসনালয় ও মসজিদসমূহ, যার মধ্যে আল্লাহর নাম অধিক স্মরণ করা হয়।

’ (সুরা : হজ, আয়াত : ৪০)

অমুসলিমদের উপাসনালয় রক্ষায় ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা ওমর (রা.) একটি রাজকীয় ফরমান জারি করেছিলেন। বায়তুল মুকাদ্দাসের খ্রিস্টানদের জন্য তিনি একটি সংবিধান রচনা করেছিলেন। তাতে লেখা ছিল, ‘বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম। এটি একটি নিরাপত্তাসংক্রান্ত চুক্তিনামা, যা মুসলমানদের আমির, আল্লাহর বান্দা ওমরের পক্ষ থেকে স্বাক্ষরিত হলো।

এই চুক্তিনামা ইলিয়্যাবাসী তথা জেরুজালেমে বসবাসরত খ্রিস্টানদের জীবন ও সম্পদ, গির্জা-ক্রুশ, সুস্থ-অসুস্থ তথা খ্রিস্টধর্মাবলম্বীদের জন্য প্রযোজ্য। সুতরাং চুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়ার পর তাদের উপাসনালয়ে অন্য কেউ অবস্থান করতে পারবে না। তাদের গির্জা ধ্বংস করা যাবে না এবং কোনো ধরনের ক্ষতি সাধন করা যাবে না। তাদের নিয়ন্ত্রিত কোনো বস্তু, তাদের ধর্মীয় প্রতীক ক্রুশ ও তাদের সম্পদের কোনো ধরনের ক্ষতি সাধন বা হামলা করা যাবে না।

_______(*তারিখুর রাসুল ওয়াল মুলুক, তারিখে তাবারি, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৪৪৯)।*

অন্যের উপাসনালয় ভেঙে ফেলার অনুমতি ইসলাম দেয়নি।মসজিদ, মন্দির বা গির্জায় হামলা করা ইসলামের দৃষ্টিতে নিন্দনীয়। ইসলামের প্রথম খলিফা আবু বকর (রা.) 'হীরা' নামক স্থানের সংখ্যালঘু খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের সঙ্গে নিরাপত্তাসংক্রান্ত যে চুক্তি করেছিলেন, তাতে বলা হয়েছে, 'তাদের গির্জা তথা ধর্মীয় উপাসনালয় ধ্বংস করা যাবে না এবং তাদের ঘরবাড়ি ভেঙে দেওয়া যাবে না। এবং ঘণ্টা বাজানো থেকে তাদের নিষেধ করা যাবে না। ধর্মীয় উৎসব উদ্‌যাপনের সময় ধর্মীয় প্রতীক ক্রুশ বের করাতে বাধা দেওয়া যাবে না।' *(ফতোয়ায়ে হক্কানিয়া : ৫/৪৮৫)*

ঐতিহাসিকভাবে ইসলামে অমুসলিমদের প্রতি ইনসাফের বহু দৃষ্টান্ত রয়েছে। মদিনার ইহুদিরা সব সময় ইসলামের বিরোধিতা করত, তথাপি রাসুল (সা.) তাদের ধর্ম পালনের অধিকার থেকে বঞ্চিত করেননি। একবার মদিনার মসজিদে বসে নবী (সা.) নাজরান থেকে আগত একটি খ্রিস্টান প্রতিনিধিদলের সঙ্গে আলোচনা করছিলেন। আলোচনার বিরতিতে তারা স্বধর্ম অনুসারে প্রার্থনা করার অনুমতি চাইলে নবী করিম (সা.) তাদের মদিনার মসজিদে প্রার্থনা করার অনুমতি দেন।

______*(ফুতুহুল বুলদান, পৃষ্ঠা ৭১)*

মানবতার বাসযোগ্য একটি সুন্দর পৃথিবী বিনির্মাণে সহাবস্থান ও সৌহার্দ্যপূর্ণ সমাজ গঠনের বিকল্প নেই।

এ প্রসঙ্গে শায়েখ আহমাদুল্লাহ বলেনঃ

ভিন্ন ধর্মাবলম্বীরা স্বাধীনভাবে তাদের ধর্মীয় কার্যকলাপ ও উৎসব পালন করবে। কোনো মুসলিমের জন্য তাতে বাধা প্রদান কিংবা আক্রমণের অনুমোদন করে না ইসলাম। এমনকি যু*দ্ধ চলাকালীনও ভিন্ন ধর্মের উপাসনালয়ে আক্রমণ করতে নিষেধ করেছেন রাহমাতুল্লিল আলামীন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। সুতরাং মুসলিমদের দুর্নাম কিংবা কোনো স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য কেউ যেন ভিন্ন ধর্মের উপাসনা কিংবা উৎসবকে টার্গেট বানাতে না পারে, সে ব্যাপারে সবার সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে।

সেই সাথে এও মনে রাখতে হবে, আপনি যদি নিজ বিশ্বাসে সত্যবাদী তথা ঈমানদার হয়ে থাকেন তবে একজন মুসলিম হিসেবে আপনি শির্কের আয়োজনে শামিল কিংবা শরীক হতে পারেন না। এটা উদারতা নয়, বরং ঈমানের ব্যাপারে উদাসীনতা। বিশ্বের সকল মুসলিম স্কলারদের ঐকমত্যে এটি হারাম এবং ঈমান-বিধ্বংসী কাজ।

মন্তব্যঃ আমার কাছে মনে হয়, ইসলাম জিহাদের মাধ্যমে পছন্দমত ধর্ম পালনে বাধা প্রদান করে বলে যারা দাবি করে এবং এমন মিথ্যা কথা বিশ্বাস করে । তারা তাদের জ্ঞানহীন

আকলের অজ্ঞতার পরিচয় দেয় বৈ কিছু নয়। ইসলাম কখনো কাউকে পছন্দ মত ধর্ম পালনে বাধা প্রদান করে না । তা উপরের আলোচনাতে সুস্পষ্ট ।

৪)ইসলামি শরীআতে জিহাদ কি কাউকে ইসলাম ধর্ম গ্রহনে বাধ্য করে??

এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা আলা কুরআনে   ইরশাদ করেছেন,,

فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُوْرٌ رَّحِيمٌ وَقُتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُوْنَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّلِمِينَ

অর্থ: অতঃপর তারা যদি নিরস্ত হয়, তবে নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। তোমরা তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে থাক, যতক্ষণ না ফিতনা খতম হয়ে যায় এবং দ্বীন আল্লাহর হয়ে যায়।[১] অতঃপর তারা যদি ক্ষান্ত হয়, তবে জালিমরা ছাড়া অন্য কারও প্রতি কোনো কঠোরতা নয়।

(সূরা বাকারা (২), আয়াত ১৯২-১৯৩)

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

যুদ্ধ শুরু করার পরও যদি মক্কার কাফের-মুশরিকরা নিজেদের কুফরী থেকে বিরত হয়ে যায় এবং ইসলাম গ্রহণ করে নেয়, তবে তাদের এই ইসলাম গ্রহণকে অমর্যাদার চোখে দেখা যাবে না। বরং আল্লাহ তাদের অতীত কুফরীর অপরাধ ক্ষমা করে দেবেন এবং ক্ষমা ছাডাও অশেষ নেআমত প্রদান করে

অপরাধ ক্ষমা করে দেবেন এবং ক্ষমা ছাড়াও অশেষ নেআমত প্রদান করে তাদের প্রতি অনুগ্রহও করবেন। আর যদি তারা ইসলাম গ্রহণ না করে, তবে যদিও অপরাপর কাফেরদের ক্ষেত্রে ইসলামী আইন এই যে, তারা স্বধর্মে থাক সত্ত্বেও যদি ইসলামী রাষ্ট্রের আনুগত্য স্বীকার করে এবং জিযিয়া (যুদ্ধ কর)

---

১. এ স্থলে এ বিষয়টি বুঝে রাখা উচিত যে, শরীআতে জিহাদের উদ্দেশ্য কাউকে ইসলাম গ্রহণে বাধ্য করা নয়। এ কারণেই সাধারণ অবস্থায় কেউ যদি কুফরেই অবিচল থাকতে চায়, তবে সে জিযয়ার মাধ্যমে ইসলামী রাষ্ট্রের আইন-কানুনের প্রতি সম্মান দেখিয়ে তা থাকতে পারে। জাযীরাতুল আরবের বিষয়টা আলাদা কেননা এটা এমন দেশ, যেখানে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সরাসরি পাঠানো হয়েছে এবং যেখানকার লোকে তার মুজিযাসমূহ চোখে দেখেছে ও তাঁর শিক্ষা সরাসরি শুনেছে। এরূপ লোক ঈমান না আনলে পূর্বেকার নবীগণের আমলে তো ব্যাপক আযাবের মাধ্যমে তাদেরকে ধ্বংস করে দেওয়া হতো। নবী

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আমলে যেহেতু সে রকম আযাব স্থগিত রাখা হয়েছে, তাই আদেশ করা হয়েছে, জাযীরাতুল আরবে কোনো কাফির নাগরিক হিসেবে বাস করতে পারবে না। এখানে তার জন্য তিনটি উপায়ই আছে হয় ইসলাম গ্রহণ করবে নয়তো জাযীরাতুল আরব ত্যাগ করে চলে যাবে অথবা যুদ্ধে কতল হয়ে যাবে।
প্রদানে অঙ্গীকারাবদ্ধ হয়, তবে তাদের হত্যা করা জায়েয নয়, বরং তাদের অধিকার সংরক্ষণ করা ইসলামী রাষ্ট্রের উপর অপরিহার্য হয়ে পড়ে। কিন্তু এ বিশেষ ধরনের কাফেররা যেহেতু আরবের অধিবাসী, সেহেতু তাদের জন্য জিযিয়া প্রদানের কোনো আইন নেই। বরং তাদের জন্য কেবল মাত্র দুটি পথই বিদ্যমান। (ক) ইসলাম গ্রহণ করা অথবা (খ) হত্যা। সুতরাং হে মুসলমানগণ! তোমরা তাদের সঙ্গে ততক্ষণ পর্যন্ত যুদ্ধ কর, যতক্ষণ না বিশ্বাসের বিভ্রান্তি অর্থাৎ শিরক তাদের মধ্য থেকে তিরোহিত হয়ে যায়। আর তাদের দ্বীন একান্তভাবেই আল্লাহ হয়ে যায়। কারণ কারও দ্বীন ও ধর্মমত বা জীবন বিধান একান্তভাবে আল্লাহর জন্যে হয়ে যাওয়ার অর্থই ইসলাম গ্রহণ করা। আর যদি তারা কুফরী থেকে ফিরে যায়, তবে তারা পরকালে ক্ষমা ও রহমতের অধিকারী তো হবেই তৎসঙ্গে পৃথিবীতে তাদের ব্যাপারে তোমাদেরকে এই আইন বলে দেওয়া হচ্ছে যে, যারা অন্যায়ভাবে আল্লাহর দান ভুলে কুফরী ও শিরক করতে থাকে, তারা ব্যতীত তাদের কেউ শাস্তি ও দুরবস্থার কবলে নিপতিত হবে না এবং এ সমস্ত লোক যখন ইসলাম গ্রহণ করল, তখন আর তাদের অন্যায় থাকলো না। অতএব তার উপর আর মৃত্যুদণ্ডের শাস্তি বর্তাবে না।
(মাআরেফুল কুরআন ১/৫৬১)

মন্তব্যঃ আমার মতে,ইসলামি শরীআতে জিহাদ কাউকে ইসলাম ধর্ম গ্রহনে বাধ্য যে করে না তার প্রমান স্বরূপ উপরে উল্লেখ করা সূরা বাকারা-২, আয়াত **১৯২-১৯৩** আয়াতটির তাফসির ব্যাখ্যাটি-ই যথেষ্ট এই ভ্রান্ত ধারনা নিরসনে।

৫)ইসলামে জিহাদের উদ্দেশ্য কি অমুসলিমদেরকে হত্যা করা?

অমুসলিমদেরকে মেরে ফেলা ইসলামী জিহাদের উদ্যেশ্য নয়। বরং এর উদ্যেশ্য হচ্ছে আল্লাহর দ্বীনকে পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠা করা। তাঁর শরিয়াহর বিধান প্রতিষ্ঠা করা এবং মানুষকে সৃষ্টির দাসত্ব থেকে স্রষ্টার দাসত্বের দিকে নিয়ে আসা। বিভিন্ন দ্বীনের অবিচার থেকে মুক্ত করে ইসলামের ন্যায়বিচারের দিকে নিয়ে আসা। আল্লাহ বলেছেন,

وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ ۚ

অর্থঃ আর তোমরা তাদের সাথে লড়াই করো যতক্ষণ না ফিতনার অবসান হয় এবং দ্বীন পূর্ণরূপে আল্লাহর জন্য হয়ে যায়। ...

(সুরা আনফাল ৮ : ৩৯)

এ আয়াতের তাফসিরে শায়খ আব্দুর রহমান আস সা'দী বলেছেন,

এখানে আল্লাহ তাঁর জন্য জিহাদের উদ্যেশ্য বর্ণনা করছেন। কাফিরদের রক্ত ঝড়ানো বা তাদের সম্পদ কেড়ে নেয়া এর উদ্যেশ্য নয়। বরং এর উদ্যেশ্য হচ্ছে দ্বীন (ইবাদাত) শুধুমাত্র আল্লাহর জন্য হয়ে যায়। এবং আল্লাহর দ্বীন অন্য সকল দ্বীনের উপর প্রবল হয়। আর যা কিছু এর বিরুদ্ধে যায়, সেগুলোকে দমন করা। হোক তা শির্ক বা অন্য কিছু – যাকে আয়াতে 'ফিতনা' কথাটির দ্বারা প্রকাশ করা হয়েছে। যদি এই উদ্যেশ্য অর্জিত হয়ে যায়, তাহলে কোনো যুদ্ধ বা হত্যা চলবে না।
[তাফসির সা'দী, পৃষ্ঠা ৯৮]

মন্তব্যঃ পূর্বে প্রথম অধ্যায় উল্লেখিত আলোচনায় পরিস্কারভাবে জিহাদের পরিচয় ও উদ্দেশ্য তুলে ধরা হয়েছে তাই ইসলামে জিহাদের উদ্দেশ্য অমুসলিমদেরকে হত্যা করে এমন কথা যে ইসলাম বিদ্বেষীদের মনগড়া, ভিত্তিহীন তা প্রমাণিত।

৬)ইসলাম কি তরবারীর জোরে প্রচারিত হয়েছে ??

মানুষের মধ্যে সর্বদা একটি প্রশ্ন ঘুরপাক খায় আর তা হল ইসলাম কি শুধুমাত্র তরবারির মাধ্যমে প্রচারিত হয়েছে? মানুষ কি বাধ্য হয়ে দীনে ইসলামে প্রবেশ করেছে? না-কি তারা এই দীনের ব্যাপারে আশ্বস্ত হয়ে এই দীনকে ভালবেসে তা গ্রহণ করেছে? রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামবিভিন্ন অঞ্চলে সাহাবায়ে কেরামের প্রেরণ করেছেন, তাঁরা সেখানে কাফেরদের সাথে যুদ্ধ করেছেন, তাদেরকে হত্যা করেছেন, অনেককে বন্দি করেছেন, সুতরাং ইসলাম কি এভাবেই শুধুমাত্র রক্তপাতের মাধ্যমে প্রচারিত হয়েছে?

কিছু মানুষের আজও ইসলামের প্রতি ভুল ধারণা রয়েছে যে ইসলাম যদি তরবারির হুমকিতে প্রচার না করা হতো তাহলে আজ বিশ্বব্যাপী লক্ষ লক্ষ মুসলিম থাকত না। নিম্নে ব্যাখ্যা তথ্যগুলি বোঝায় যে ইসলাম তরবারির জোরে নয় বরং সত্য ও যুক্তির মাধ্যমে প্রসারিত।
ইসলাম, ধর্ম পালনের স্বাধীনতা সর্বদা স্বীকৃত করেছে যা কুরআন নিজেই স্পষ্ট ভাষায় সমর্থন করে।

দীন গ্রহণের ব্যাপারে কোন জবরদস্তি নেই। নিশ্চয় হিদায়াত স্পষ্ট হয়েছে ভ্রষ্টতা থেকে। অতএব, যে ব্যক্তি তাগূতকে অস্বীকার করে এবং আল্লাহর প্রতি ঈমান আনে, অবশ্যই সে মজবুত রশি আঁকড়ে ধরে, যা ছিন্ন হবার নয়। আর আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ। (বাকারা-২৫৬)
ইসলাম কখনো মুনাফিকদের সমর্থন করেনা বরং বিশ্বাসীদের অনুসন্ধান করে। ধার্মিক স্বাধীনতা হচ্ছে একটাই রাস্তা যা আমাদের বিশ্বাস ও বাস্তবতাকে নিশ্চিত করে। এজন্যই ইসলাম পুরোপুরি ধার্মিক স্বাধীনতার সমর্থন করে।
বিপরিতভাবে, শক্তি হৃদয় পরিশুদ্ধ নয় কেবলমাত্র বহিরাগত প্রভাব ছড়াতে পারে। এই পন্থা একজনকে ভন্ড করবে কারণ সে জনসমক্ষে তো এক দৃঢ় বিশ্বাসী কিন্তু বাস্তবে সেটা নয়। জোর জবরদস্তি শুধুমাত্র মুনাফিকের মাত্রা বৃদ্ধি করে অনুরূপ বিশ্বাসীদের সংখ্যা হ্রাস পায়। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে উপদেশ দিয়েছিলেন এক উপদেশদাতা হিসেবে কাম করা ব্যতীত শাসনকর্তা।
অতএব আপনি উপদেশ দিন আপনি তো কেবল একজন উপদেশদাতা, শাসনকর্তা নয়। অন্যান্য আয়াতে সুসংবাদের বাহক এবং। আল্লাহর শাস্তির সতর্ককারী। হিসেবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। (সূরা সাবা ৩৪-২৮)
মানুষকে শুধুমাত্র ইসলামের মৌলিক বিষয়গুলি স্মরণ করিয়ে দেওয়ার নবী সাঃ এর একমাত্র কর্তব্য ছিল।প্রথম আয়াত থেকে বুঝতে পারি যে ইসলাম গ্রহণে কাউকে বাধ্য করার দরকার নেই কারণ এটি স্বাধীন ও সহজ ধর্ম যেখানে মিথ্যা ও সত্য পৃথক করা সহজ।
ঐতিহাসিকভাবে, ইসলাম ৮০০ বছর ধরে স্পেনে রাজত্ব করে যেখানে খ্রিষ্টান ও অন্যান্য ধর্ম স্বাধীনতার সঙ্গে নিজের ধর্ম পালন করতো।
মেডেলিস্ট মুসলিম অঞ্চলে খ্রিষ্টান ও ইহুদি বহু শতাব্দি ধরে বিদ্যমান।মিশর, মরক্কো প্যালেস্টাইন, লেবানন এর মত মুসলিম দেশে অধিকাংশ খ্রিস্টান ইহুদী পাওয়া যায়।
হোস্টেন স্মিথ তার “দ্য ওয়ার্ল্ডস রিলিজিয়নস” বইয়ে তিনি ইসলামের রাজত্বতে ইহুদি ও খ্রিস্টান স্বাধীনভাবে কিরূপ ধর্ম পালন করছে তা সুন্দর ভাবে ফুটিয়ে তুলেছে।
নবী সাঃ ইহুদি ও খ্রিস্টানদের প্রতি এক নথি লিখেছিলেন। সেই নথিতে দেখা হয়েছিল যে ইহুদী ও খ্রিস্টান সকল অপমান ও ক্ষতি থেকে রক্ষা পাবে। দ্বিতীয়ত, তারা মুসলিম অনুরূপ সমান অধিকার পাবে। স্বাধীনভাবে নিজের ধর্ম পালন করতে পারবে।
স্মিথ তার বইয়ে বলেন পরবর্তীতে মুসলিমরা এই নথিকে উদাহরণ স্বরূপ ব্যবহার করেন।
যেহেতু মুসলিমরা প্রায় ১০০০ বছর ধরে ভারতে রাজত্ব চালিয়েছিলেন, তাদের ক্ষমতা ছিল যে অমুসলিমদের বাধ্য করে ধর্মান্তরিত করা কিন্তু তা না করে স্বাধীনতা দেয় যার ফল আজ, আমারা ৮০% র বেশি অমুসলিম দেখতে পায়।
আফ্রিকা, মালয়েশিয়া ইন্দোনেশিয়ার বিশ্বব্যাপী সবচেয়ে মুসলিম জনসংখ্যা রয়েছে যা সেনাবাহিনী নয় বরং নৈতিক অনুশাসনের ফল। ঐতিহাসিকভাবে, ইসলামীক শাসনের অধীনে

থাকা অনেক অঞ্চল যাদের মুসলিম সরকার নেই তবুও স্থানীয় জনগণ নিজেদের মুসলমান বলে মনে করে। তিনারা সত্য প্রচারে যন্ত্র ও বেদনা সহ্য করে যা অন্যদের অনুপ্রাণিত করেছিল। সিরিয়া, জর্ডান, উত্তর আফ্রিকা, এশিয়া, বলকান, মিশর এবং স্পেনের পাশাপাশি অঞ্চলে ইসলাম প্রসারনের একটাই সত্য তা হচ্ছে ইসলামের নিতি ও নৈতিকতা। বিপরীতভাবে, উপনিবেশীয় রীতিনীতি মানুষদের জোরপূর্বক নির্বাসিত করে যার ফলে তারা অনেক দুঃখ ও কষ্ট সহ্য করতে হয়েছিল।

বিখ্যাত ইতিহাসবিদ ডে লেসি ও লেরির মতে ধর্মান্ধ মুসলমানদের পদ্ধতি হচ্ছে এটা যে তারা রাস্তায় মিছিল করে এবং তলোয়ারের জোর দেখায়।

ইসলাম প্রচারে যদি কোন তরবারি ব্যবহার করা হতো তা ছিল যুক্তি ও তর্কের তরবারি যে তলোয়ার মানুষের হৃদয় ও মনকে জয় করে।

কোরআন শরীফে উল্লেখ রয়েছে, আপনি আপনার পালনকর্তার পথে আহ্বান করুন প্রজ্ঞা ও উত্তম উপদেশের সাথে এবং তাদের সাথে এমনভাবে বিতর্ক করুন যা সর্বউত্তম, নিশ্চয়ই আপনার পালনকর্তা সবচেয়ে বেশি জানেন কে তার পথে থেকে বিচ্যুত হয়েছে এবং কে সৎ পথে আছে। (কুরআন ১৬-১২৫)

ইসলাম যে তরবারির জোরে ছড়িয়ে পড়েনি তা আমরা নবী(সাঃ) এর জীবনকে দুই ধাপে দেখলে বোঝতে পারি। প্রথমত, মক্কায় তার মিশনের প্রথম ১৩ বছর অতিবাহিত করার পর, শেষ ১১ বছর মদিনাতে অতিবাহিত করেন। সেই সময় মদিনাতে শক্তি প্রয়োগ করা অবাস্তব ছিল কারণ তিনি এবং মুসলমান উভয়ই মক্কায় সংখ্যালঘু ছিল।

দ্বিতীয়ত, মদিনায় একটি ছোট্ট ইয়াহুদী জনগোষ্ঠী ছিল যারা সেখানে আসার পর ইসলাম গ্রহণের ইচ্ছুক ছিল না তাই গোত্রের মধ্যে শান্তি বজায় রাখার জন্য তিনি এক চুক্তিও ইহুদীদের মধ্যে বানায়।

এই চুক্তিতে লেখা হয়েছিল, ইহুদিরা অপমান ও ক্ষতি থেকে বিরত থাকবে, ধর্মের পুরোপুরি স্বাধীনতা দেওয়া হবে, মুসলিম এবং ইহুদি উভয়ই সম্মানের সাথে আচরণ করবে।

অতঃপর, এটি নিঃসন্দেহ ভাবে প্রমাণ করে যে নবী সাল্লাল্লাহু আলাই সাল্লাম কাউকে ইসলাম গ্রহণে বাধ্য করেননি বরং তিনি অন্যান্য ধর্মের অনুসারীদের সাথে চুক্তি করেছিলেন। এই সকল তথ্যগুলি প্রমাণ করে যে ইসলাম তরবারির মাধ্যমে নয় বরং এর মহৎ শিক্ষার মাধ্যমে প্রসারিত।

- এবার জেনে নেয়া যাক ইসলাম প্রচার প্রসারের কারন সম্পর্কে বর্তমান সময়ের আধুনিক গবেষণা লব্ধ কিছু তথ্যঃ

বর্তমান বিশ্বের সবচেয়ে প্রভাবশালী ও দ্রুত বিস্তরণশীল ধর্মের নাম ইসলাম। যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক পিউ রিসার্চ সেন্টারের এক সমীক্ষার তথ্য খুবই চমকপ্রদ :

২০৫০ সাল নাগাদ ইসলাম ধর্মবিশ্বাসীদের সংখ্যা দাঁড়াবে ২.৮ বিলিয়ন। অর্থাৎ বিশ্বের জনসংখ্যার ৩০ শতাংশ। ভারতে মুসলিম জনসংখ্যা উল্লেখযোগ্য হারে বেড়ে তা ইন্দোনেশিয়ার মুসলিম জনসংখ্যাকেও ছাড়িয়ে যেতে পারে।

ইউরোপেও মুসলিম জনসংখ্যা বেড়ে তা মোট জনসংখ্যার ১০ শতাংশে গিয়ে দাঁড়াতে পারে।

ইসলামের বিস্তার ও প্রভাবের কারণঃ

ক) ইসলামের নীতি-আদর্শ ও বৈশিষ্ট্য—ইসলামের চেয়ে আধ্যাত্মিক, উদার ও মানবিক ধর্ম আর নেই।

খ) মুসলমানদের মধ্যে জন্মহার তুলনামূলকভাবে বেশি।

গ) ধর্মান্তরিত হয়ে ইসলামের অনুসারী হওয়ার বিপুল প্রবণতা।

ইসলাম তরবারীর জোরে প্রচারিত হতো তবে নিশ্চই ইসলামের বিস্তার ও প্রভাবের কারণ হিসেবে যুক্তরাষ্ট্র ভিত্তিক পিউ রিসার্চ সেন্টারের উল্লেখিত তথ্যে তা উঠে আসতো।

উকিপিডিয়ার তথ্য মতে ধারণা করা হয় যে, ২০১৫ থেকে ২০৬০ সালের মধ্যে মুসলিম জনসংখ্যা প্রায় ৭০% বৃদ্ধি পাবে, যার ফলে বিশ্বে মুসলিম জনসংখ্যা ১.৭৬ (বা ২) বিলিয়ন থেকে ৩ বিলিয়নে উন্নীত হবে।[১] একই সময়ে গোটা বিশ্বের জনসংখ্যা প্রায় ৩২% বৃদ্ধি পাবে।[২] ২০১১ সালে পিউ রিসার্চ কর্তৃক পরিচালিত একটি গবেষণায় বলা হয় যে, মুসলিম জনসংখ্যার উপর ধর্মান্তরের কোন প্রভাব নাও পড়তে পারে। কারণ ইসলাম ধর্মে ধর্মান্তরিতদের সংখ্যা ইসলাম ত্যাগকারীদের সংখ্যার সমান বলে মনে করা হয়।[৩][৪][৫] ২০১৫ সালে পিউ রিসার্চ সেন্টারের আরেকটি গবেষণায় বলা হয়, ২০১০ থেকে ২০৫০ সালের মধ্যে ধর্মান্তরের মাধ্যমে প্রায় ৩০ লক্ষ মানুষ ইসলামে প্রবেশ করবে বলে ধারণা করা হয়.।

জনশ্রুতি আছে—ইউরোপ-অস্ট্রেলিয়ায় সপ্তাহে অন্তর ৫০ জন ইসলামে দীক্ষা নেন, যাঁদের বেশির ভাগ তরুণ প্রজন্ম।

পিউ রিসার্চ সেন্টারের সমীক্ষা থেকে আভাস পাওয়া যায়, ইউরোপের ফ্রান্সসহ বিভিন্ন দেশে মুসলিমের সংখ্যা যে হারে বাড়ছে, যে হারে বাড়ছে ইসলাম গ্রহণের ঢেউ, তাতে ওই সব দেশও একসময় মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশে পরিণত হতে পারে। তরবারীর জোরে নয় বরং মানুষের সহজাতসভাবে সত্যের প্রতি আকৃষ্ট হওয়া জ্ঞান অন্বেবেষণে স্পৃহা ও দাওয়াতি কার্যক্রমের মাধ্যমে।

রেফারেন্সঃ উইকিপিডিয়া। পিউ রিসার্চ সেন্টার থেকে প্রকাশিত রিসার্চ পেপারের অনলাইন কপি ও প্রাসঙ্গিক প্রতিবেদন।

"The Changing Global Religious Landscape"। Pew Research Center's Religion & Public Life Project (ইংরেজি ভাষায়)। ২০১৭-০৪-০৫। সংগ্রহের তারিখ ২০২২-০৬-০৯।

↑ "Muslims projected to be fastest-growing major religious group"। Pew Research Center's Religion & Public Life Project (ইংরেজি ভাষায়)। সংগ্রহের তারিখ ২০২২-০৬-০৯।
↑ "Why Muslims are the world's fastest-growing religious group | Pew Research Center"। web.archive.org। ২০১৭-০৩-২০। সংগ্রহের তারিখ ২০২৫-০৫-০৬।
↑ Author, No (২০১১-০১-২৭)। "The Future of the Global Muslim Population"। Pew Research Center (ইংরেজি ভাষায়)। সংগ্রহের তারিখ ২০২৫-০৪-৩০।
↑ Johnson, Todd M.; Grim, Brian J. (২৫ মার্চ ২০১৩)। The World's Religions in Figures: An Introduction to International Religious Demography। John Wiley & Sons। আইএসবিএন 9781118323038। ৯ ডিসেম্বর ২০১৯ তারিখে মূল থেকে আর্কাইভ করা। সংগ্রহের তারিখ ৩ এপ্রিল ২০১৭।

মন্তব্যঃ

ইসলাম যে তরবারীর জোরে প্রচারিত হয়নি তা আমরা উপরের আলোচনা থেকে সক্ষম হয়েছি। যারা মনে করে ইসলাম তরবারীর জোরে প্রচারিত হয়েছে তাদের বলতে চাই । ইন্দোনেশিয়া বিশ্বের সর্ববৃহৎ ইসলামী দেশ হলো কি করে? ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া, ফিলিপাইন্স, ব্রুনাই ও অন্যান্য দেশে তো কোনো মুসলিম বাহিনী কখনোই যায় নি। বিগত অর্ধ শতাব্দি যাবৎ ইসলাম The firstest growing religion বা সর্বাধিক বর্ধনশীল ধর্ম। ইউরোপ ও আমেরিকা-সহ সকল দেশের হাজার হাজার মানুষ ইসলাম গ্রহণ করছেন। কোন তরবারীর ভয়ে তারা ইসলাম গ্রহণ করছেন?

৭)কুরআনে জিহাদের আয়াতে কোন কাফেরদের সাথে যুদ্ধের আদেশ দেয়া হয়েছে??/ উল্লেখিত কাফের বলতে কি সকল অমুসলিমদের বোঝানো হয়েছে??

সমস্ত মুসলিম উম্মত এ ব্যাপারে একমত যে, মদীনায় হিজরতের পূর্বে কাফেরদের সঙ্গে 'জিহাদ' ও কিতাল (যুদ্ধ-বিগ্রহ) নিষিদ্ধ ছিল। সে সময়ে অবতীর্ণ কুরআন মাজীদের সব আয়াতেই কাফেরদের অন্যায়-অত্যাচার নীরবে সহ্য করে ধৈর্য ও সহিষ্ণুতা, ক্ষমা ও উদারতা প্রদর্শনের শিক্ষা দেওয়া হয়।

হযরত রবী ইবনে আনাস প্রমুখ সাহাবায়ে কেরাম রাযি.-এর উক্তি অনুসারে মদীনায় হিজরতের পর সর্বপ্রথম কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার ব্যাপারে উপরিউক্ত আয়াতটি নাযিল হয়। তবে হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাযি.-এর এক বর্ণনা অনুযায়ী কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের নির্দেশ সম্পর্কিত এটিই প্রথম আয়াত। সুরা- হজ্জ,আয়াত-৩৯। যথা-

اِذِنَ لِلَّذِيۡنَ يُقۡتَلُوۡنَ بِاَنَّهُمۡ ظُلِمُوۡا

কিন্তু অধিকাংশ সাহাবী রাযি. এবং তাবেয়ীন রহ.-এর মতে এ প্রসঙ্গে সূরা বাকারায় উপরোল্লিখিত আয়াতই প্রথম আয়াত। তবে হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাযি. যে আয়াতটিকে এ প্রসঙ্গে নাযিলকৃত প্রথম আয়াত বলে মত প্রকাশ করেছেন, সে আয়াতটিকেও এ প্রসঙ্গে প্রথম দিকে নাযিলকৃত আয়াতসমূহের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার কারণে প্রথম আয়াত বলা চলে।

বিঃদ্রঃ কুরআন মাজীদে 'ফিতনা' শব্দটি বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। তার মধ্যে একটি অর্থ হলো জুলুম ও অত্যাচার। এখানে সম্ভবত সে অর্থ বোঝানোই উদ্দেশ্য। মক্কার মুশরিকগণ মুসলিমদেরকে তাদের দ্বীন থেকে ফেরানোর জন্য চরম অন্যায় ও ন্যাক্কারজনক কঠোরতা অবলম্বন করেছিল। সুতরাং এ স্থলে দৃশ্যত এটাই বোঝানো হচ্ছে যে, হত্যা করা মূলত যদিও কোনো ভালো কাজ নয় কিন্তু ফিতনা তার চেয়ে আরও মন্দ কাজ। যেখানে হত্যা ছাড়া ফিতনার দুয়ার বন্ধ করা সম্ভব হয় না, সেখানে তা করা ছাড়া উপায় কি ?
এ আয়াতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, মুসলমানগণ কেবলমাত্র সেসব কাফেরদের সঙ্গেই যুদ্ধ করবে, যারা তাদের বিপক্ষে সম্মুখ সমরে উপস্থিত হবে। এর অর্থ এই যে, নারী, শিশু, বৃদ্ধ, ধর্মীয় কাজে সংসার ত্যাগী উপাসনারত সন্ন্যাসী-পাদ্রী, প্রভৃতি এবং তেমনিভাবে অন্ধ, খঞ্জ, পঙ্গু, অসমর্থ অথবা যারা কাফেরদের অধীনে মেহনত মজদূরী করে। কিন্তু তাদের সঙ্গে যুদ্ধে শরীক না হয়-সেসব লোককে যুদ্ধে হত্যা করা জায়েয নয়। কেননা আয়াতের নির্দেশে কেবলমাত্র তাদের সঙ্গেই যুদ্ধ করার হুকুম রয়েছে। যারা মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে। কিন্তু উল্লিখিত শ্রেণীর লোকদের কেউই যুদ্ধে যোগদানকারী নয়। এজন্য ফেকাহশাস্ত্রবিদ ইমামগণ বলেন, যদি কোনো নারী, বৃদ্ধ অথবা ধর্মপ্রচারক বা ধর্মীয় মিশনারির লোক কাফেরদের পক্ষে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে অথবা কোনো প্রকার যুদ্ধে তাদের সাহায্য করতে থাকে, তবে তাদেরকেও হত্যা করা জায়েয। কারণ তারা তো 'যারা তোমাদের সঙ্গে যুদ্ধ করে' এই আয়াতের আওতাভুক্ত। (মাযহারী, কুরতুবী, জাস্সাস্, মাআরেফুল কুরআন ১/৫৫৭)

পুরো মক্কী যিন্দেগীতে মুসলমানদেরকে কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার ব্যাপারে বাধা দান করা হয়েছিল এবং সর্বদা ক্ষমা ও উদারতার শিক্ষা প্রদান করা হয়েছিল। কাজেই উল্লিখিত আয়াত নাযিল হওয়ার পর সাহাবীগণের ধারণা হয়েছিল যে, হয়তো কোনো কোনো ক্ষেত্রে কাফেরদিগকে হত্যা করা নিষিদ্ধ ও দূষনীয় হয়ে থাকবে। এ ধারণার অপনোদন কল্পে ইরশাদ হলো-

وَالۡفِتۡنَةُ اَشَدُّ مِنَ الۡقَتۡلِ

(এবং ফেতনা বা দাঙ্গা-হাঙ্গামা সৃষ্টি করা হত্যা অপেক্ষাও কঠিন অপরাধ।)

অর্থাৎ এ কথা তো অবশ্যই সত্য ও সর্বজনবিদিত যে, নরহত্যা নিকৃষ্ট কর্ম। কিন্তু মক্কার কাফেরদের কুফরী ও শিরকের উপর অটল থাকা এবং মুসলমানদিগকে উমরা ও হজ্জের মতো ইবাদতের পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা অতি গুরুতর ও কঠিন অপরাধ। এরূপ প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করার কারণেই তাদেরকে হত্যা করার অনুমতি প্রদান করা হলো। আলোচ্য আয়াতে উল্লিখিত فِتْنَةٌ (ফিতনাহ) শব্দটির দ্বারা কুফর, শিরক এবং মুসলমানদের ইবাদতে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করাকেই বুঝানো হয়েছে।

(জাস্সাস, কুরতুবী ও মাআরেফুল কুরআন ১/৫৫৯)

মন্তব্যঃ

উপরের আলোচনা থেকে প্রতীয়মান হয় যে কুরআনে জিহাদের আয়াতে যে কাফেরদের সাথে যুদ্ধের আদেশ দেয়া হয়েছে মুলত উল্লেখিত কাফের বলতে সকল অমুসলিমদের বোঝানো হয়নি বরং মুসলিমদেরকে তাদের দ্বীন থেকে ফেরানোর জন্য তাদের ইবাদতের পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি , চরম অন্যায় ও ন্যাক্কারজনক কঠোরতা অবলম্বন করে যে সকল কাফের আয়াতে তাদের কে উদ্দেশ্য করা হয়েছে।

তৃতীয় অধ্যায়।

ইসলামের বিরুদ্ধে বিতর্ক তৈরিতে পশ্চিমা বিশ্বের সম্পৃক্ততা।

ইসলামের বিরুদ্ধে যুদ্ধ অথবা বিপক্ষে লড়াই শব্দের ব্যবহার

ইসলামের বিরুদ্ধে যুদ্ধ বা ইসলামের বিপক্ষে লড়াই (ইংরেজি: War on Islam; আরবি: الحرب علي الاسلام) হলো এমন একটি শব্দাংশ, যা সামরিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে ব্যবহার করে ইসলামি সমাজ ব্যবস্থার ক্ষতি, দুর্বল বা ধ্বংস করার সমন্বিত প্রচেষ্টাকে বর্ণনা করতে ব্যবহৃত হয়। এটি সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের অজুহাতে ইসলামি বিশ্বে আক্রমণ ও হস্তক্ষেপ করা বা ইসলাম সম্পর্কে সমাজে নেতিবাচক ধারণা তৈরির লক্ষ্যে মিডিয়ার অপপ্রচারকে বুঝাতেও ব্যবহৃত হয়। ইসলামের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ধারণাটি বিশেষ করে ইসলামপন্থী গোষ্ঠীগুলোর মধ্যে জনপ্রিয়, যারা বিশ্বাস করেন যে অমুসলিমরা; বিশেষত পশ্চিমা বিশ্ব ও কথিত ভুয়া মুসলিমরা ইসলামের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছে। এই ধারণাটি আধুনিকীকরণ, ধর্মনিরপেক্ষতা ও আন্তর্জাতিক রাজনীতির পরিবর্তন সম্পর্কিত নানা বিষয়কে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে। তবে ক্রুসেডকে প্রায়শ এর সূচনা বিন্দু হিসাবে বিবেচনা করা হয়।

মুসলিম সমাজব্যবস্থার বিরুদ্ধে পশ্চিমা বিশ্বের ব্যাপক বিদ্বেষপূর্ণ ষড়যন্ত্র/ইসলাম-বিদ্বেষী কর্মকাণ্ডে পশ্চিমা সমর্থন এর কারন।

ইসলামবিরোধী মনোভাবকে মূলত পশ্চিমা সমাজের অন্তর্নিহিত বৈশিষ্ট্য হিসেবে যারা ব্যাখ্যা করেন, তাদের মধ্যে রয়েছেন ইতিহাসবিদ রজার সেভরি ও বোস্টনের লেখক জেমস ক্যারল। সেভরি'র মতে, ইসলাম যখন ইউরোপের দিকে অগ্রসর হচ্ছিল (উমাইয়া খিলাফত ৭৩২ সালে ট্যুরসের যুদ্ধে পরাজয়ের আগ পর্যন্ত উত্তর ফ্রান্স পর্যন্ত পৌঁছে গিয়েছিল; উসমানীয়রা ১৫২৯ ও ১৬৮৩ সালে ভিয়েনা অবরোধ করে), তখন খ্রিস্টান জগত ইসলামকে হুমকি হিসেবে দেখেছিল। এর ফলে তৎকালীন খ্রিস্ট রাজারা ইসলামকে দোষারোপ করে খ্রিস্টধর্মকে ইসলামের শত্রুতে পরিণত করেছিল; যদিও উভয় ধর্মই ঐশী এবং শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের শিক্ষা দেয়।[১][২]

ক্রুসেডের উত্তরাধিকার তথা জেরুজালেম দাবিতে ইউরোপীয় উপনিবেশবাদ।

মুসলমানদের জীবনধারা ধ্বংসের এক সুদূরপ্রসারী প্রচেষ্টা করে। উদাহরণস্বরূপ, সাইয়েদ কুতুব বিশ্বাস করতেন, পশ্চিমাদের উদ্দেশ্য ছিল ইসলামি বিশ্বাসের ভিত নাড়িয়ে দেওয়া। তার মতে, মধ্যযুগীয় খ্রিস্টান ক্রুসেড কোনো রাজনৈতিক সাম্রাজ্যবাদ ছিল না, বরং আধুনিক সাম্রাজ্যবাদ সেই পুরোনো ক্রুসেডের একটি নতুন রূপ, যার মাধ্যমে মুসলিম ভূমিগুলিকে পুনরায় দখল করার প্রচেষ্টা চালানো হয়েছে। [৩]

সেভরি লিখেছেন:"তাই আশ্চর্যের কিছু নেই যে, মধ্যযুগীয় ধারণার সঙ্গে উনিশ শতকের খ্রিস্টান মিশনারিদের বক্তব্যে একটি গভীর সাদৃশ্য দেখা যায়। যেমন মধ্যযুগে অনেক খ্রিস্টান বিশ্বাস করত যে, নবী মুহাম্মদের দোষ এতটাই প্রকট যে, তাঁর সম্পর্কে যত খারাপ কথা বলা হোক না কেন, তা কমই হবে। এই মানসিকতারই প্রতিফলন পাওয়া যায় ১৯ শতকের সেসব মিশনারি পুস্তিকায়, যেখানে ভারতীয় মুসলমানদের আহ্বান জানানো হয়েছিল যে, তারা যেন তাদেরকে শেখানো সেই 'ভ্রান্ত ধর্ম' ত্যাগ করে।

এমনকি সেই সময়কার বক্তব্য ও মনোভাবেও প্রাচীন ক্রুসেড-আন্দোলনের প্রতিধ্বনি শোনা যায়। উদাহরণস্বরূপ, যখন ১৮৩০ সালে ফরাসিরা আলজেরিয়া দখল করে, তখন তারা ঘোষণা দেয় যে, এটি 'খ্রিস্টান বিশ্বের সর্বোচ্চ কল্যাণের' উদ্দেশ্যেই করা হয়েছে বলে ফরাসি খ্রিস্টান মিশনারিরা আখ্যায়িত করে। একিভাবে স্ট্র্যাটফোর্ড ক্যানিং যেভাবে উসমানীয় সাম্রাজ্যকে 'সমস্যা' হিসেবে চিহ্নিত করে তার সমাধান হিসেবে পরামর্শ দিয়েছিলেন যে, উসমানীয় সাম্রাজ্যকে আধুনিক ইউরোপের অন্তর্ভুক্ত করা উচিত—তাও যেন খ্রিস্টানদের তত্ত্বাবধানে হয়।

১৮৮১ সালে যখন ফরাসিরা তিউনিসিয়া আক্রমণ করে, তখনও তারা এই সামরিক পদক্ষেপকে একটি পবিত্র কর্তব্য হিসেবে বিবেচনা করে; যেন এটি এমন এক 'উন্নততর সভ্যতার ঋণ, যা তারা পশ্চাদপদ জাতিগুলোর ওপর পরিশোধ করছে'। [৪]

- *Savory, R.M., Christendom vs Islam: interaction & co-existence, Introduction to Islamic Civilisation, p.127*
- *Savory, R.M., Christendom vs Islam: interaction & co-existence, Introduction to Islamic Civilisation, p.1তমা*
- *Qutb, Milestones, p.159-160*
- *Savory, R.M., Christendom vs Islam: interaction & co-existence, Introduction to Islamic Civilisation, p.134*

আধুনিক যুগের ইসলাম বিরোধী কিছু ঘটনা ও এর পেছনে নেপথ্যে কারা।

ইসলামের বিরুদ্ধে "যুদ্ধ" চালানোর অভিযোগ যে সকল শক্তির বিরুদ্ধে উত্থাপিত হয়েছে, তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো পাশ্চাত্য শক্তিগুলো (বিশেষ করে যুক্তরাষ্ট্র), পাশ্চাত্যঘেঁষা মুসলিম রাষ্ট্রসমূহ; যেমন—জর্ডান, মিশর, সৌদি আরব, কুয়েত, কাতার, সংযুক্ত আরব আমিরাত, বাহরাইন, ওমান এবং পাকিস্তান। পাশাপাশি কিছু অমুসলিম ও অপাশ্চাত্য রাষ্ট্র; যেমন—ইসরায়েল (ইসরায়েলি-ফিলিস্তিনি সংঘাত), মিয়ানমার (রোহিঙ্গা গণহত্যা), সার্বিয়া (বসনীয় গণহত্যা), রাশিয়া (চেচনিয়া যুদ্ধ) [১][২][৩][৪] ভারত (কাশ্মীর সংকট) ও সাম্প্রতিককালে চীনও (শিনজিয়াং সংকট) এসব অভিযোগের আওতায় পড়েছে। ওসামা বিন লাদেন এক ভাষণে উল্লেখ করেছেন, "জাতিসংঘ আজ থেকে অর্ধশতাব্দী আগেই একটি প্রস্তাব পাস করে মুসলিম কাশ্মীরকে স্বাধীনতার অধিকার দিয়েছিল। অথচ ক্রুসেডারদের নেতা জর্জ বুশ ঘোষণা করেছেন, তিনি তার ধর্মান্তরিত এজেন্টকে (পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট পারভেজ মুশাররফ) কাশ্মীরি মুজাহিদদের ঘাঁটি বন্ধ করার আদেশ দেবেন। এটি প্রমাণ করে, এটি আসলে মুসলমানদের বিরুদ্ধে একটি যৌথ ইহুদি-হিন্দু যুদ্ধ।" [৫]

এছাড়া পশ্চিমা শক্তি দ্বারা ফিলিস্তিন ভূখণ্ডে ইস্রায়েলি দখলদারিত্বকে সমর্থনকে বিশেষভাবে ইসলামবিরোধী যুদ্ধের অংশ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। ওসামা বিন লাদেন বলেন, "পশ্চিমা বিশ্ব সমর্থিত গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত হামাস সরকারকে অস্বীকার করাই প্রমাণ করে যে, পশ্চিমারা ফিলিস্তিনিদের বিরুদ্ধে অবিচার, আগ্রাসন ও বিদ্বেষ বহাল রেখেছে।" [৬]

দ্য ওয়ার অন ইসলাম গ্রন্থের ভারতীয় মুসলিম লেখক এনভার মাসুদ বলেন, "যুক্তরাষ্ট্রে মুসলমানদের কোনো উচ্চপর্যায়ের নীতিনির্ধারণী অথবা গণমাধ্যমে পদ নেই; অথচ মার্কিন

ইহুদিরা প্রায় প্রতিটি আরব-ইসরায়েল নীতি-সম্পর্কিত পদে নিয়োজিত।" ওসামা বিন লাদেন ভারতের কাশ্মীর দখলকেও এক ধরনের "ইহুদি-হিন্দু যুদ্ধ" হিসেবে অভিহিত করেছেন। [৭]
আধুনিক যুগে ইসলামের ওপর আক্রমণের উদাহরণ হল, মিডিয়ায় ইসলাম ধর্মের নেতিবাচক উপস্থাপন এবং সন্ত্রাসবিরোধী যুদ্ধ বা "ওয়ার অন টেরর"। [৮] কখনো কখনো এসব অভিযোগে মুসলমানদেরও জড়ানো হয়েছে এবং তাদের মুরতাদ বা ধর্মত্যাগী বলে অভিযুক্ত করা হয়েছে। আয়াতুল্লাহ খোমেনি বলেন, "পুঁজিবাদের দালালরা" (পাশ্চাত্যপন্থী ধর্মনিরপেক্ষ মুসলিমরা) মুসলিম বিশ্বের প্রতিটি কোণায় তরুণদের বিভ্রান্ত করতে ব্যস্ত। তারা মিথ্যা প্রচারণার মাধ্যমে ইসলামের ক্ষতি করে চলেছে।" [৯] [১০]
২০১৬ সালে যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা বলেন, "আমরা একটি নতুন মতবাদের মুখোমুখি হয়েছি; যেমন আমরা একসময় নাৎসিবাদ, ফ্যাসিবাদ, সাম্রাজ্যবাদ ও কম্যুনিজমের মুখোমুখি হয়েছিলাম। সেই মতবাদটি হল ইসলামের বিরুদ্ধে যুদ্ধ এবং এটি পৃথিবীর ১.৭ বিলিয়ন মানুষের মধ্যে একটি বিষাক্ত ক্যান্সারের মতো, যাকে অপসারণ করতেই হবে। [১১]
২০০৫ সালের দিকে ডেনীয় কার্টুন বিতর্কের সময় ডেনমার্কের একটি পত্রিকায় নবী মুহাম্মদের ব্যঙ্গচিত্র প্রকাশিত হওয়ার পর সিরিয়ায় ডেনমার্ক ও নরওয়ের দূতাবাসে আগুন দেয়া হয়। ওসামা বিন লাদেন এই ঘটনাকে ইহুদি-ক্রুসেডার যুদ্ধের অংশ হিসেবে উল্লেখ করেন। [১২[১৩]][১৪][১৫] এক অডিও বার্তায় [১৬] তিনি বলেন, "তোমরা নিজেদের অবিশ্বাসের সীমা ছাড়িয়ে গিয়েছ; তোমরা বিতর্ক বা যুদ্ধের শিষ্টাচারও মানো না এবং তোমরা নবীর অপমানসূচক কার্টুনও প্রকাশের মত জঘন্য কাজও করেছ।" তিনি এটিকে "মুসলিম গ্রামবাসীদের উপর পশ্চিমাদের বোমা হামলার চেয়েও বড় ও ভয়াবহ ঘটনা" হিসেবে বর্ণনা করেন। [১৭]
ইরানের সর্বোচ্চ নেতা আয়াতুল্লাহ আলী খোমেনি এই বিতর্ককে "ইহুদি ষড়যন্ত্র" বলে অভিহিত করেন। [১৮] ফিলিস্তিনি দূতও অভিযোগ করেন যে, ইসরায়েলের লিকুদ পার্টি এই ব্যঙ্গচিত্রকে বিশ্বজুড়ে ছড়িয়ে দেয়ার পরিকল্পনা করেছিল, যেন পশ্চিমা বিশ্ব ও মুসলিম বিশ্বের মধ্যে দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হয়। [১৯] [২০]
এছাড়াও আইএস নেতা আবু বকর আল-বাগদাদির নিহত হওয়ার পর জর্দানের একটি পত্রিকায় একজন বিশ্লেষক লিখেন, আল-বাগদাদি আসলে ইসরায়েলি গোয়েন্দা সংস্থা মোসাদের একজন এজেন্ট ছিলেন, যাকে ইসলামকে কলুষিত করার জন্যই প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছিল। [২১]

রেফারেন্সঃউইকিপিডিয়া হতে ইসলামের বিরুদ্ধে যুদ্ধ বিতর্ক পরিচ্ছেদ থেকে সংগ্রহের তারিখঃ১৭/৫/২০২৫।

১]Osama bin Laden says: "This is why they established institutions and enacted laws to maintain their supremacy by creating the United Nations and the veto power.... They regard jihad for the sake of God or defending one's self or his country as an act of terror. US and Europe consider jihad groups in Palestine, Chechnya, Iraq and Afghanistan as terrorist groups,

so how could we talk or have understanding with them without using weapons?"

২] Human Rights Watch: Chechnya: Research Shows Widespread and Systematic Use of Torture

৩] Chechnya Holds Parliamentary Vote, Morning Edition, NPR, 28 November 2005.

৪] Government efforts help only some IDPs rebuild their lives ওয়েব্যাক মেশিনে আর্কাইভকৃত ২০১৩-০৮-২১ তারিখে , IDMC, 13 August 2007

৫] "Archived copy"। আগস্ট ১৬, ২০০৭ তারিখে মূল থেকে আর্কাইভ করা। সংগ্রহের তারিখ ২০১৬-০২-০৮।

৬] "Terrorism Monitor - The Jamestown Foundation"। ১৪ আগস্ট ২০০৭ তারিখে মূল থেকে আর্কাইভ করা। সংগ্রহের তারিখ ১৮ মার্চ ২০১৫।

৭] "What is worse than terrorist attacks?" (পিডিএফ)।

৮]"Osama bin Laden dead: The one time that he mentioned Kashmir"। The Economic Times। ডিসেম্বর ১৫, ২০১৩ তারিখে মূল থেকে আর্কাইভ করা। সংগ্রহের তারিখ ১৮ মার্চ ২০১৫।

৯]"Breaking News, World News and Video from Al Jazeera"। Al Jazeera (ইংরেজি ভাষায়)। সংগ্রহের তারিখ ২০২৫-০৪-২১।

১০] Khomeini, Islam and Revolution, (1981), p.127

১১] Andrew Kaczynski (২২ নভেম্বর ২০১৬)। "Michael Flynn in August: Islamism a 'vicious cancer' in body of all Muslims that 'has to be excised'"। CNN। সংগ্রহের তারিখ ২০২০-১০-১৭।

১২] "Bin Laden Says West Is Waging War Against Islam"। ২০০৮-০৫-২২ তারিখে মূল থেকে আর্কাইভ করা। সংগ্রহের তারিখ ২০০৭-১০-২৫।

১৩]- The racist crusade against Muslims ওয়েব্যাক মেশিনে আর্কাইভকৃত ২০০৬-০৫-০৬ তারিখে accessed 10-23-2007

১৪]- 'A conspiracy against Islam' ওয়েব্যাক মেশিনে আর্কাইভকৃত ২০০৭-০৯-১৪ তারিখে accessed 10-23-2007

১৫]-Islamophobia Watch, Documenting the war against Islam ওয়েব্যাক মেশিনে আর্কাইভকৃত ২০০৭-১০-১৯ তারিখে categories of the website include "Danish Cartoons"

১৬]- "Bin Laden Threatens Europe over Mohammed Cartoons | DW | 20.03.2008"। Deutsche Welle। জানুয়ারি ১, ২০২০ তারিখে মূল থেকে আর্কাইভ করা। সংগ্রহের তারিখ মার্চ ২৮, ২০০৮।

১৭]-Transcript released by the SITE Institute, a U.S. group that monitors terror messages

১৮]- "Qatari University Lecturer Ali Muhi Al-Din Al-Qardaghi: Muhammad Cartoon Is a Jewish Attempt to Divert European Hatred from Jews to Muslims", Al-Jazeera/MemriTV, 2 March 2006.

১৯]- "Cartoons 'part of Zionist plot'", Guardian, 7 February 2006.

২০]- "PA: Likud behind Muhammad cartoons"। Ynetnews (ইংরেজি ভাষায়)। ২০০৬-০২-১৩। সংগ্রহের তারিখ ২০২৫-০৪-২১।

২১]- "The 'War Against Islam': How a Conspiracy Theory Drove and Shaped the Islamist Movement"। European Eye on Radicalization (ইংরেজি ভাষায়)। ২০১৯-১২-০৬। ২০২১-০৮-১৮ তারিখে মূল থেকে আর্কাইভ করা। সংগ্রহের তারিখ ২০২০-১০-১৭।

চতুর্থ অধ্যায়।

ইসলামি শরয়ী জিহাদের ফজিলত ও মর্যাদা

শরয়ী জিহাদের ফজিলতঃ

জিহাদ ও যুদ্ধের ফযীলত সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলার কুরআনে বলেনঃ

اِنَّ اللّٰهَ اشۡتَرٰی مِنَ الۡمُؤۡمِنِیۡنَ اَنۡفُسَهُمۡ وَ اَمۡوَالَهُمۡ بِاَنَّ لَهُمُ الۡجَنَّۃَ ؕ یُقَاتِلُوۡنَ فِیۡ سَبِیۡلِ اللّٰهِ فَیَقۡتُلُوۡنَ وَ یُقۡتَلُوۡنَ ۟ وَعۡدًا عَلَیۡهِ حَقًّا فِی التَّوۡرٰىۃِ وَ الۡاِنۡجِیۡلِ وَ الۡقُرۡاٰنِ ؕ وَ مَنۡ اَوۡفٰی بِعَهۡدِهٖ مِنَ اللّٰهِ فَاسۡتَبۡشِرُوۡا بِبَیۡعِکُمُ الَّذِیۡ بَایَعۡتُمۡ بِهٖ ؕ وَ ذٰلِکَ هُوَ الۡفَوۡزُ الۡعَظِیۡمُ ﴿۱۱۱﴾اَلتَّآئِبُوۡنَ الۡعٰبِدُوۡنَ الۡحٰمِدُوۡنَ السَّآئِحُوۡنَ الرّٰکِعُوۡنَ السّٰجِدُوۡنَ الۡاٰمِرُوۡنَ بِالۡمَعۡرُوۡفِ وَ النَّاهُوۡنَ عَنِ الۡمُنۡکَرِ وَ الۡحٰفِظُوۡنَ لِحُدُوۡدِ اللّٰهِ ؕ وَ بَشِّرِ الۡمُؤۡمِنِیۡنَ ﴿۱۱۲﴾

•*বস্তুত আল্লাহ মুমিনদের কাছ থেকে তাদের জীবন ও তাদের সম্পদ খরিদ করে নিয়েছেন, তাদের জন্য জান্নাত আছে-এর বিনিময়ে। তারা আল্লাহর পথে যুদ্ধ করে। ফলে হত্যা করে ও নিহতও হয়। এটা এক সত্য প্রতিশ্রুতি, যার দায়িত্ব আল্লাহ তাওরাত ও ইনজীলেও নিয়েছেন এবং কুরআনেও। আল্লাহ অপেক্ষা বেশি প্রতিশ্রুতি রক্ষাকারী আর কে আছে? সুতরাং তোমরা*

আল্লাহর সঙ্গে যে সওদা করেছ, সেই সওদার জন্য তোমরা আনন্দিত হও এবং এটাই মহা সাফল্য।

• *তারা তাওবাকারী, ইবাদাতকারী, আল্লাহর প্রশংসাকারী, সিয়াম পালনকারী, রুকূকারী, সিজদাকারী, সৎকাজের আদেশদাতা, অসৎকাজের নিষেধকারী এবং আল্লাহর নির্ধারিত সীমারেখা হেফাযতকারী। আর মুমিনদেরকে তুমি সুসংবাদ দাও।*

(সুরাঃআত-তাওবা,আয়াতঃ১১১-১১২)

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيۡنَ اٰمَنُوۡا هَلۡ اَدُلُّكُمۡ عَلٰى تِجَارَةٍ تُنۡجِيۡكُمۡ مِّنۡ عَذَابٍ اَلِيۡمٍ ﴿۱۰﴾تُؤۡمِنُوۡنَ بِاللّٰهِ وَ رَسُوۡلِهٖ وَ تُجَاهِدُوۡنَ فِىۡ سَبِيۡلِ اللّٰهِ بِاَمۡوَالِكُمۡ وَ اَنۡفُسِكُمۡ ؕ ذٰلِكُمۡ خَيۡرٌ لَّكُمۡ اِنۡ كُنۡتُمۡ تَعۡلَمُوۡنَ ﴿ۙ۱۱﴾يَغۡفِرۡ لَكُمۡ ذُنُوۡبَكُمۡ وَ يُدۡخِلۡكُمۡ جَنّٰتٍ تَجۡرِىۡ مِنۡ تَحۡتِهَا الۡاَنۡهٰرُ وَ مَسٰكِنَ طَيِّبَةً فِىۡ جَنّٰتِ عَدۡنٍ ؕ ذٰلِكَ الۡفَوۡزُ الۡعَظِيۡمُ ﴿ۙ۱۲﴾

• *হে ঈমানদারগণ, আমি কি তোমাদেরকে এমন এক ব্যবসায়ের সন্ধান দেব, যা তোমাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক আযাব থেকে রক্ষা করবে?*

• *তোমরা আল্লাহর প্রতি ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান আনবে এবং তোমরা তোমাদের ধন-সম্পদ ও জীবন দিয়ে আল্লাহর পথে জিহাদ করবে। এটাই তোমাদের জন্য কল্যাণকর, যদি তোমরা জানতে।*

• *তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের পাপসমূহ ক্ষমা করে দিবেন। আর তোমাদেরকে এমন জান্নাতসমূহে প্রবেশ করাবেন যার তলদেশে নহরসমূহ প্রবাহিত এবং চিরস্থায়ী জান্নাতসমূহে উত্তম আবাসগুলোতেও (প্রবেশ করবেন)। এটাই মহাসাফল্য।*

(সুরাঃ আস-সফ,আয়াতঃ১০-১২)

জামে' আত-তিরমিজি : ১৬১৯

সহিহ হাদিস

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا يَعْدِلُ الْجِهَادَ قَالَ " لاَ تَسْتَطِيعُونَهُ " . فَرَدُّوا عَلَيْهِ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلاَثًا كُلُّ ذَلِكَ يَقُولُ " لاَ تَسْتَطِيعُونَهُ " . فَقَالَ فِي الثَّالِثَةِ " مَثَلُ الْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ مَثَلُ الْقَائِمِ الصَّائِمِ الَّذِي لاَ يَفْتُرُ مِنْ صَلاَةٍ وَلاَ صِيَامٍ حَتَّى يَرْجِعَ الْمُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ " . قَالَ أَبُو عِيسَى وَفِي الْبَابِ عَنِ الشِّفَاءِ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُبْشِيٍّ وَأَبِي مُوسَى وَأَبِي سَعِيدٍ وَأُمِّ مَالِكٍ الْبَهْزِيَّةِ وَأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ . وَهَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَقَدْ رُوِيَ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم .

আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিতঃ

তিনি বলেন, প্রশ্ন করা হল, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! কোন কাজ জিহাদের সমতুল্য হতে পারে? তিনি বললেনঃ তোমরা তা করতে পারবে না। তারা দুই অথবা তিনবার একই প্রশ্ন করল।

প্রতি বারই তিনি বললেন, তোমরা তা করতে পারবে না। তৃতীয় বারে তিনি বললেনঃ আল্লাহ্‌ তা’আলার রাস্তায় জিহাদকারী লোকের সাথে এমন লোকের তুলনা হতে পারে যে লোক অক্লান্তভাবে নামায-রোযায় ব্যস্ত থাকে যতক্ষণ না আল্লাহ্‌ তা’আলার পথের মুজাহিদ ফিরে না আসে।সহীহ্‌, সহীহা (২৮৯৬), মুসলিম

_____শিফাআ, আবদুল্লাহ ইবনু হুবশী, আবূ মূসা, আবূ সাঈদ, উম্মু মালিক আল-বাহ্‌যিয়্যা ও আনাস ইবনু মালিক (রাঃ) হতেও এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে । এ হাদীসটি হাসান সহীহ্‌ । এটা আবূ হুরাইরা (রাঃ) এর বরাতে নাবী (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হতে বিভিন্ন সূত্রে বর্ণিত হয়েছে ।

জামে' আত-তিরমিজি : **১৬২০** সহিহ হাদিস।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَزِيعٍ، حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، حَدَّثَنِي مَرْزُوقٌ أَبُو بَكْرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَعْنِي " يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ الْمُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ هُوَ عَلَىَّ ضَامِنٌ إِنْ قَبَضْتُهُ أَوْرَثْتُهُ الْجَنَّةَ وَإِنْ رَجَعْتُهُ رَجَعْتُهُ بِأَجْرٍ أَوْ غَنِيمَةٍ " . قَالَ هُوَ صَحِيحٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ .

আনাস ইবনু মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিতঃ
তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ অর্থাৎ আল্লাহ্‌ তা’আলা বলেনঃ আমার পথে জিহাদকারীর জন্য আমি নিজেই যামিন। আমি তার জীবনটা নিয়ে নিলে তবে তাকে জান্নাতের উত্তরাধিকারী বানিয়ে দেই। আমি তাকে (যুদ্ধক্ষেত্র হতে) ফিরিয়ে আনলে তবে তাকে ছাওয়াব বা গানীমাতসহ ফিরিয়ে আনি।
_____সহীহ্‌, তা’লীকুর রাগীব (২/১৭৮)
এ হাদীসটিকে আবূ ঈসা উল্লেখিত সনদসূত্রে সহীহ্‌ গারীব বলেছেন ।

ইসলামি শরয়ী জিহাদ ও অন্যদের লড়াইয়ের মধ্যে পার্থক্যঃ

উপরোক্ত আয়াতসমূহ থেকেই শরয়ী জিহাদ ও অন্যদের যুদ্ধের মধ্যকার পার্থক্য স্পষ্ট হয়ে যায়। কেননা:

১. অন্যান্য যুদ্ধ তাগুতের পথে হয় পক্ষান্তরে জিহাদ হয় আল্লাহর পথে। আল্লাহর পথে হওয়ার অর্থ কী তা নিম্নোক্ত হাদীসে উল্লেখিত হয়েছে,

جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ا مَا الْقِتَالُ فِي سَبِيلِ اللهِ ؟ فَإِنَّ أَحَدَنَا يُقَاتِلُ غَضَبًا، وَيُقَاتِلُ حَمِيَّةً، فَرَفَعَ إِلَيْهِ رَأْسَهُ، فَقَالَ مَنْ قَاتَلَ لِتَكُونَ كَلِمَةَ اللَّهِ هِيَ الْعَلْيَا فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّه . ِ

এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকটে এসে জিজ্ঞেস করল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! " আল্লাহর পথে লড়াইয়ের পরিচয় কী? আমরা কেউ ক্রোধান্বিত হওয়ায় লড়াই করি, কেউ জাত্যাভিমানের বশবর্তী হয়ে লড়াই করি?

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার প্রতি মুখ তুলে তাকালেন অতঃপর বললেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর কালিমাকে বুলন্দ করার জন্য লড়াই করে সে আল্লাহর পথে।

(সহীহুল বুখারী ১/২৩, সহীহু মুসলিম ১/১৪০)

অন্য বর্ণনায় এসেছে-

جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: الرَّجُلُ يُقَاتِلُ الْمَغْنَمِ، وَالرَّجُلُ يُقَاتِلُ لِلذِّكْرِ، وَالرَّجُلُ يُقَاتِلُ لِيَرَى مَكَانَهُ، فَمَنْ في سَبِيلِ اللَّهِ ؟ قَالَ مَنْ قَاتَلَ لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّه . ِ

এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকটে এসে জিজ্ঞেস করল, এক ব্যক্তি গনীমতের সম্পদের জন্য লড়াই করে, এক ব্যক্তি খ্যাতির জন্য লড়াই করে এবং এক ব্যক্তি বীরত্ব প্রদর্শনের জন্য লড়াই করে, এদের মধ্যে কে আল্লাহর পথে? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর কালিমাকে বুলন্দ করার জন্য যুদ্ধ করে সে আল্লাহর পথে।

(ছহীহুল বুখারী ১/৩৯৪, ছহীহু মুসলিম ১/১৩৯)

মানুষের মধ্যে কে উত্তম মুমিনঃ

আল্লাহ কুরানে বলেন-

یٰۤاَیُّهَا الَّذِیۡنَ اٰمَنُوۡا هَلۡ اَدُلُّكُمۡ عَلٰی تِجَارَۃٍ تُنۡجِیۡكُمۡ مِّنۡ عَذَابٍ اَلِیۡمٍ﴿۱۰﴾ - تُؤۡمِنُوۡنَ بِاللّٰهِ وَ رَسُوۡلِهٖ وَ تُجَاهِدُوۡنَ فِیۡ سَبِیۡلِ اللّٰهِ بِاَمۡوَالِكُمۡ وَ اَنۡفُسِكُمۡ ؕ ذٰلِكُمۡ خَیۡرٌ لَّكُمۡ اِنۡ كُنۡتُمۡ تَعۡلَمُوۡنَ ﴿ۙ۱۱﴾ - یَغۡفِرۡ لَكُمۡ ذُنُوۡبَكُمۡ وَ یُدۡخِلۡكُمۡ جَنّٰتٍ تَجۡرِیۡ مِنۡ تَحۡتِهَا الۡاَنۡهٰرُ وَ مَسٰكِنَ طَیِّبَۃً فِیۡ جَنّٰتِ عَدۡنٍ ؕ ذٰلِكَ الۡفَوۡزُ الۡعَظِیۡمُ ﴿ۙ۱۲﴾

আল্লাহ্ তাআলা বলেনঃ “ওহে যারা ঈমান এনেছ? আমি কি তোমাদেরকে এমন এক বাণিজ্যের কথা বলে দিব, যা তোমাদেরকে রক্ষা করবে এক যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি থেকে? তা এই যে, তোমরা ঈমান আনবে আল্লাহ্র প্রতি ও তাঁর রসূলের প্রতি এবং জিহাদ করবে আল্লাহ্র পথে তোমাদের ধন-সম্পদ ও তোমাদের জীবন দিয়ে। এটাই তোমাদের জন্য শ্রেয়, যদি তোমরা জানতে। আল্লাহ্ ক্ষমা করে দিবেন তোমাদের গুনাহসমূহ এবং দাখিল করবেন জান্নাতে, প্রবাহিত হতে থাকবে যার নিম্নদেশে নহরসমূহ এবং এমন মনোরম গৃহ যা রয়েছে অনন্তকাল বাসের জন্য। এটাই মহা সাফল্য।” (আস্ সফ ১০-১২)

এ প্রসঙ্গে হাদিস জেনে আসা যাক।

সহিহ বুখারী : ২৭৮৬

حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ حَدَّثَنِي عَطَاءُ بْنُ يَزِيدَ اللَّيْثِيُّ، أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ ـ رضى الله عنه ـ حَدَّثَهُ قَالَ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَىُّ النَّاسِ أَفْضَلُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " مُؤْمِنٌ يُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ ". قَالُوا ثُمَّ مَنْ قَالَ " مُؤْمِنٌ فِي شِعْبٍ مِنَ الشِّعَابِ يَتَّقِي اللَّهَ، وَيَدَعُ النَّاسَ مِنْ شَرِّهِ ".

আবূ সা’ঈদ খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণিতঃ

তিনি বলেন, জিজ্ঞেস করা হলো, ‘হে আল্লাহর রসূল! মানুষের মধ্যে কে উত্তম?’ আল্লাহর রসূল (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, ‘সেই মু’মিন যে নিজ জান ও মাল দিয়ে আল্লাহ্র পথে জিহাদ করে।’ সাহাবীগণ বললেন, ‘অতঃপর কে?’ তিনি বললেন, ‘সেই মু’মিন আল্লাহ্র ভয়ে যে পাহাড়ের কোন গুহায় অবস্থান নেয় এবং স্বীয় অনিষ্ট থেকে লোকদেরকে নিরাপদ রাখে।’

আল্লাহ্র পথের মুজাহিদদের মর্যাদা।

সহিহ বুখারী : ২৭৯০-সহিহ হাদিস

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ، عَنْ هِلاَلِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ـ رضى الله عنه ـ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ وَأَقَامَ الصَّلاَةَ وَصَامَ رَمَضَانَ، كَانَ حَقًّا عَلَى اللَّهِ أَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ جَاهَدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، أَوْ جَلَسَ فِي أَرْضِهِ الَّتِي وُلِدَ فِيهَا ". فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفَلاَ نُبَشِّرُ النَّاسَ. قَالَ " إِنَّ فِي الْجَنَّةِ مِائَةَ دَرَجَةٍ أَعَدَّهَا اللَّهُ لِلْمُجَاهِدِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، مَا بَيْنَ الدَّرَجَتَيْنِ كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ، فَإِذَا سَأَلْتُمُ اللَّهَ فَاسْأَلُوهُ الْفِرْدَوْسَ، فَإِنَّهُ أَوْسَطُ الْجَنَّةِ وَأَعْلَى الْجَنَّةِ، أُرَاهُ فَوْقَهُ عَرْشُ الرَّحْمَنِ، وَمِنْهُ تَفَجَّرُ أَنْهَارُ الْجَنَّةِ ". قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ فُلَيْحٍ عَنْ أَبِيهِ " وَفَوْقَهُ عَرْشُ الرَّحْمَنِ ".

আবূ হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিতঃ

তিনি বলেন, নবী (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের প্রতি যে ঈমান আনল, সালাত আদায় করল ও রমযানের সিয়াম পালন করল সে আল্লাহ্‌র পথে জিহাদ করুক কিংবা স্বীয় জন্মভূমিতে বসে থাকুক, তাকে জান্নাতে প্রবেশ করিয়ে দেওয়া আল্লাহ্‌র দায়িত্ব হয়ে যায়। সাহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহর রসূল! আমরা কি লোকদের এ সুসংবাদ পৌঁছে দিব না? তিনি বলেন, আল্লাহ্‌র পথে জিহাদকারীদের জন্য আল্লাহ্ তা’আলা জান্নাতে একশ’টি মর্যাদার স্তর প্রস্তুত রেখেছেন। দু’টি স্তরের ব্যবধান আসমান ও যমীনের দূরত্বের মত। তোমরা আল্লাহ্‌র কাছে চাইলে ফেরদাউস চাইবে। কেননা এটাই হলো সবচেয়ে উত্তম ও সর্বোচ্চ জান্নাত। আমার মনে হয়, রসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এও বলেছেন, এর উপরে রয়েছে আরশে রহমান। আর সেখান থেকে জান্নাতের নহরসমূহ প্রবাহিত হচ্ছে। মুহাম্মদ ইব্‌নু ফুলাইহ্ (রহঃ) তাঁর পিতার সূত্রে (নিঃসন্দেহে) বলেন, এর উপরে রয়েছে আরশে রহমান।

সহিহ বুখারী : ২৭৯১-সহিহ হাদিস

حَدَّثَنَا مُوسَى، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، حَدَّثَنَا أَبُو رَجَاءٍ، عَنْ سَمُرَةَ، قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم " رَأَيْتُ اللَّيْلَةَ رَجُلَيْنِ أَتَيَانِي فَصَعِدَا بِي الشَّجَرَةَ، فَأَدْخَلاَنِي دَارًا هِيَ أَحْسَنُ وَأَفْضَلُ، لَمْ أَرَ قَطُّ أَحْسَنَ مِنْهَا قَالاَ أَمَّا هَذِهِ الدَّارُ فَدَارُ الشُّهَدَاءِ ".

সামুরা (রাঃ) হতে বর্ণিতঃ

তিনি বলেন, নবী (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, আমি আজ রাতে (স্বপ্নে) দেখতে পেলাম যে, দু’ব্যক্তি আমার নিকট এল এবং আমাকে নিয়ে একটি গাছে উঠলো। অতঃপর আমাকে এমন উৎকৃষ্ট একটি ঘরে প্রবেশ করিয়ে দিল এর আগে আমি কখনো এর চেয়ে সুন্দর ঘর দেখিনি। সে দু’ব্যক্তি আমাকে বলল, এই ঘরটি হচ্ছে শহীদদের ঘর।

আল্লাহ্‌র রাস্তায় যার দু’ পা ধূলো-ধূসরিত হয় তার সওয়াব।

সুনানে আন-নাসায়ী : ৩১১৬-সহিহ হাদিস

أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ، قَالَ: لَحِقَنِي عَبَايَةُ بْنُ رَافِعٍ - وَأَنَا مَاشٍ إِلَى الْجُمُعَةِ، فَقَالَ: أَبْشِرْ، فَإِنَّ خُطَاكَ هَذِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ -، سَمِعْتُ أَبَا عَبْسٍ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ اغْبَرَّتْ قَدَمَاهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَهُوَ حَرَامٌ عَلَى النَّارِ»

ইয়াযীদ ইব্‌ন আবূ মারইয়াম (রহঃ) হতে বর্ণিতঃ

‘আবায়া ইব্‌ন রাফি (রহঃ) আমার সঙ্গে সাক্ষাত করলেন, তখন আমি জুমু‘আর সালাত আদায়ের জন্য যাচ্ছিলাম। তিনি বললেনঃ সুসংবাদ গ্রহণ করুন। আপনার এই পদক্ষেপ হচ্ছে আল্লাহ্‌র পথে। আমি আবূ আবস (রাঃ)-কে বলতে শুনেছি যে, রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু

'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ যে ব্যক্তির দুই পা আল্লাহ্‌র পথে ধূলি-ধূসরিত হয়, সে জাহান্নামের জন্য হারাম হয়ে যায়।

আল্লাহ্‌র রাস্তায় জিহাদকারীর জন্য আল্লাহ্‌ যে বিষয়ের দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন।

সুনানে আন-নাসায়ী : ৩১২২-সহিহ হাদিস

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ، قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ، عَنْ ابْنِ الْقَاسِمِ، قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «تَكَفَّلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لِمَنْ جَاهَدَ فِي سَبِيلِهِ، لَا يُخْرِجُهُ إِلَّا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِهِ، وَتَصْدِيقُ كَلِمَتِهِ بِأَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ، أَوْ يَرُدَّهُ إِلَى مَسْكَنِهِ الَّذِي خَرَجَ مِنْهُ مَعَ مَا نَالَ مِنْ أَجْرٍ أَوْ غَنِيمَةٍ»

আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিতঃ

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র রাস্তায় জিহাদ করেছে- তাকে আল্লাহ্‌র রাস্তায় জিহাদ এবং তাঁর কালিমা-ই তাওহীদের বিশ্বাস ব্যতীত আর কিছু বের করেনি, মহান মহীয়ান আল্লাহ্‌ তাকে জান্নাতে প্রবেশ করানোর অথবা তার যে বাসস্থান হতে সে বের হয়েছিল- সওয়াব ও গনীমতের সম্পদসহ সেখানে ফিরিয়ে আনার দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন।

পুরুষ এবং নারীর জন্য জিহাদ করার আকাংখা ও শাহাদাত লাভের দু'আ।

সহিহ বুখারী : ২৭৮৮-সহিহ হাদিস

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ـ رضى الله عنه ـ أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَدْخُلُ عَلَى أُمِّ حَرَامٍ بِنْتِ مِلْحَانَ، فَتُطْعِمُهُ، وَكَانَتْ أُمُّ حَرَامٍ تَحْتَ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، فَدَخَلَ عَلَيْهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَأَطْعَمَتْهُ وَجَعَلَتْ تَفْلِي رَأْسَهُ، فَنَامَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ثُمَّ اسْتَيْقَظَ وَهُوَ يَضْحَكُ. قَالَتْ فَقُلْتُ وَمَا يُضْحِكُكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ " نَاسٌ مِنْ أُمَّتِي عُرِضُوا عَلَىَّ، غُزَاةً فِي سَبِيلِ اللَّهِ، يَرْكَبُونَ ثَبَجَ هَذَا الْبَحْرِ، مُلُوكًا عَلَى الأَسِرَّةِ، أَوْ مِثْلُ الْمُلُوكِ عَلَى الأَسِرَّةِ ". شَكَّ إِسْحَاقُ. قَالَتْ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ادْعُ اللَّهَ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ. فَدَعَا لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ثُمَّ وَضَعَ رَأْسَهُ، ثُمَّ اسْتَيْقَظَ وَهُوَ يَضْحَكُ فَقُلْتُ وَمَا يُضْحِكُكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ " نَاسٌ مِنْ أُمَّتِي عُرِضُوا عَلَىَّ، غُزَاةً فِي سَبِيلِ اللَّهِ ". كَمَا قَالَ فِي الأَوَّلِ. قَالَتْ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، ادْعُ اللَّهَ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ. قَالَ " أَنْتِ مِنَ الأَوَّلِينَ ". فَرَكِبَتِ الْبَحْرَ فِي زَمَانِ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ، فَصُرِعَتْ عَنْ دَابَّتِهَا حِينَ خَرَجَتْ مِنَ الْبَحْرِ، فَهَلَكَتْ.

আনাস ইব্‌নু মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিতঃ

তিনি বলেন, আল্লাহর রসূল (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) উম্মু হারাম বিন্‌তু মিলহান (রাঃ)-এর নিকট যাতায়াত করতেন এবং তিনি আল্লাহর রসূল (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)–কে খেতে দিতেন। উম্মু হারাম (রাঃ) ছিলেন, ‘উবাদা ইব্‌নু সামিত (রাঃ)-এর স্ত্রী। একদা আল্লাহর রসূল (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর ঘরে গেলে তিনি তাঁকে আহার করান এবং তাঁর মাথার উকুন বাছতে থাকেন। এক সময় আল্লাহর রসূল (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ঘুমিয়ে পড়েন। তিনি হাসতে হাসতে ঘুম হতে জাগলেন। উম্মু হারাম (রাঃ) বলেন, আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম, ‘হে আল্লাহর রসূল! হাসির কারণ কী?’ তিনি বললেন, ‘আমার উম্মাতের কিছু ব্যাক্তিকে আল্লাহ্‌র পথে জিহাদরত অবস্থায় আমার সামনে পেশ করা হয়। তারা এ সমুদ্রের মাঝে এমনভাবে আরোহী যেমন বাদশাহ তখতের উপর, অথবা বলেছেন, বাদশাহ্‌র মত তখ্‌তে উপবিষ্ট।’ এ শব্দ বর্ণনায় ইসহাক (রহঃ) সন্দেহ করেছেন। উম্মু হারাম (রাঃ) বলেন, ‘আমি বললাম, হে আল্লাহ্‌র রসূল! আল্লাহ্‌র নিকট দু’আ করুন যেন আমাকে তিনি তাদের অন্তর্ভুক্ত করেন।’ আল্লাহ্‌র রসূল (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর জন্য দু’আ করলেন। অতঃপর আল্লাহর রসূল (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আবার ঘুমিয়ে পড়েন। অতঃপর হাসতে হাসতে জেগে উঠলেন। আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম, ‘হে আল্লাহর রসূল! আপনার হাসার কারণ কি?’ তিনি বললেন, ‘আমার উম্মাতের মধ্য থেকে আল্লাহ্‌র পথে জিহাদরত কিছু ব্যক্তিকে আমার সামনে পেশ করা হয়।’ পরবর্তী অংশ প্রথম উক্তির মত। উম্মু হারাম (রাঃ) বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহ্‌র রসূল! আপনি আল্লাহ্‌র নিকট দু‘আ করুন, যেন আমাকে তিনি তাঁদের অন্তর্ভুক্ত করেন। তিনি বললেন, তুমি তো প্রথম দলের মধ্যেই আছ। অতঃপর মু’আবিয়া ইব্‌নু আবূ সুফিয়ান (রাঃ)-এর সময় উম্মু হারাম (রাঃ) জিহাদের উদ্দেশে সামুদ্রিক সফরে যান এবং সমুদ্র থেকে যখন বের হন তখন তিনি তাঁর সওয়ারী থেকে ছিটকে পড়েন। এতে তিনি শাহাদাত লাভ করেন।

পঞ্চম অধ্যায়।

ইসলামে সংঘটিত কিছু হওয়া জিহাদের/যুদ্ধের কারন ও প্রেক্ষাপট।

যুদ্ধের অনুমতিঃ

ভয়ভীতি ও বিপজ্জনক অবস্থা মদীনায় মুসলিমদের অস্তিত্বের জন্য একটি মারাত্মক চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছিল এবং যদ্দ্বারা এটা সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছিল যে, কুরাইশরা কোনক্রমেই তাদের বিদ্বেষপরায়ণতা ও এক গুঁয়েমি পরিহার করতে প্রস্তুত নয়। অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ

তা'আলা মুসলিমগণকে যুদ্ধের অনুমতি প্রদান করেন, কিন্তু তখন পর্যন্ত মুসলিমদের উপর যুদ্ধ ফরজ হয় নি। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা যে আয়াত নাযিল করলেন তা হচ্ছে নিম্নরূপঃ

أُذِنَ لِلَّذِيْنَ يُقَاتَلُوْنَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوْا وَإِنَّ اللهَ عَلٰى نَصْرِهِمْ لَقَدِيْرٌ) [الحج:

" যাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা হয় তাদেরকে যুদ্ধের অনুমতি দেয়া হল, কেননা তাদের প্রতি অত্যাচার করা হয়েছে। আল্লাহ তাদেরকে সাহায্য করতে অবশ্যই সক্ষম।'
(আল-হাজ্জ ২২ : ৩৯)

যুদ্ধের অনুমতি তো নাযিল হলও তা শুধু কুরাইশদের সাথেই সীমাবদ্ধ ছিল। তারপর বিভিন্ন অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে যুদ্ধের অনুমতির বিস্তৃতি ঘটে। এমনকি তা ওয়াজিবের স্তর বা পর্যায়ে উপনীত হয়। তখন এ নির্দেশ কুরাইশ ব্যতিত অন্যাদের বেলায় প্রযোজ্য হয়। এ সব ঘটনার বিস্তারিত আলোচনা করার পূর্বে সংক্ষেপে এসব স্তর বা পর্যায় সম্পর্কে আলোকপাত করার প্রয়োজন মনে করছি :

১. মক্কার কুরাইশ মুশরিকদেরকে যুদ্ধরত গণ্য করা। কেননা তারাই প্রথম শত্রুতা আরম্ভ করে। ফলে তাদের সাথে যুদ্ধ করা মুসলমানদের পক্ষে আবশ্যক হয়ে পড়ে। আর সাথে সাথে মক্কার অন্যান্য মুশরিক ব্যতিত কেবল তাদের ধন-সম্পদকে বাজেয়াপ্ত করাও জরুরি হয়ে পড়ে।

২. ওদের সাথে যুদ্ধ করা যারা আরবের সকল মুশরিক কুরাইশদের সাথে মিলিত ও একত্রিত হয়। অনুরূপ কুরাইশ ব্যতীত অন্যান্য গোষ্ঠী যারা পৃথক পৃথকভাবে মুসলমানদের সাথে শত্রুতা পোষণ করে।

৩. সে সব ইহুদীদের সাথে যুদ্ধ করা যারা রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর সাথে সন্ধি ও প্রতিশ্রুতি থাকা সত্ত্বেও খিয়ানত করেছে এবং মুশরিকদের সাথে জোটবদ্ধ হয়েছে ও অঙ্গীকার ভঙ্গ করেছে।

৪. আহলে কিতাবদের মধ্যে যারা মুসলমানদের সাথে শত্রুতা পোষণ করে তাদের সাথে যুদ্ধ করা (যেমন খ্রীষ্টান সম্প্রদায়) যতক্ষণ তারা বিনীত হয়ে যিজিয়া কর না দেয়।

৫. মুশরিক, ইহুদী, খ্রীষ্টান নির্বিশেষে যারাই ইসলাম গ্রহণ করবে তাদের সাথে যুদ্ধ করা থেকে বিরত থাকা । ইসলামের হদ ব্যতীত তাকে কিছু করা যাবেনা। তার বাকী হিসাব আল্লাহর হাতে।

যুদ্ধের অনুমতি তো নাযিল হল, কিন্তু যে অবস্থার প্রেক্ষাপটে নাযিল হল ওটা যেহেতু শুধু কুরাইশদেরই শক্তিমত্ততা ও একগুঁয়েমির ফল ছিল সেহেতু এটাই ছিল সব চাইতে গুরুত্বপূর্ণ ও বিজ্ঞোচিত কাজ যে মুসলিমগণ নিজেদের দখল সীমা কুরাইশদের ঐ বাণিজ্য পথ পর্যন্ত বিস্তৃত করে নেবে যা মক্কা হতে সিরিয়া পর্যন্ত চালু ছিল। এ কারণেই দখল সীমা বিস্তৃতির উদ্দেশ্যে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) দুটি পরিকল্পনা গ্রহণ করলেন। পরিকল্পনা দুটি হচ্ছে যথাক্রমে :

১. যে সকল গোত্র এ রাজপথের আশপাশে কিংবা এ রাজপথ হতে মদীনা পর্যন্ত বিস্তৃত জায়গার মধ্যবর্তী এলাকায় বসবাসরত ছিল তাদের সঙ্গে মিত্রতা স্থাপন এবং যুদ্ধ না করার চুক্তি সম্পাদন।

২. এ রাজপথের উপর টহলদারী দল প্রেরণ।

প্রথম পরিকল্পনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ব্যাপার ছিল ঐ ঘটনাটি যা পূর্বে ইহুদীদের সঙ্গে সংঘটিত হয়েছিল এবং যে চুক্তিটির বিস্তারিত বিবরণ ইতোপূর্বে প্রদত্ত হয়েছে। সামরিক তৎপরতা শুরু করার পূর্বে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এভাবে জুহাইনা গোত্রের সঙ্গেও বন্ধুত্ব, মিত্রতা ও পরস্পর পরস্পরের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত না হওয়ার একটি চুক্তি সম্পাদন করেছিলেন। মদীনা থেকে তিন মনজিলের অধিক অর্থাৎ ৪০ থেকে ৫০ মাইলের ব্যবধানে তাদের আবাসস্থল অবস্থিত ছিল। টহলদারী সৈন্যদের পরিভ্রমণ কালে লোকজনদের সঙ্গে কয়েকটি চুক্তিও সম্পাদন করেছিলেন যার আলোচনা পরে আসছে। দ্বিতীয় পরিকল্পনাটি ছিল যুদ্ধ বিগ্রহের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত।

মদীনায় হিজরতের পর মুসলিমদের যে সকল সারিয়্যাহ ও গায্ওয়ায় অংশ গ্রহণ করতে হয়েছিল তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে লিপিবদ্ধ করা হল।

সারিয়্য ও গাযওয়া পরিচয় ও পার্থক্যঃ

মহানবী (সঃ) এর জীবদ্দশায় ১৯ টি গাযওয়া ২৪ টি সারিয়াসহ মোট ৪৩ যুদ্ধ সংগঠিত হয়। বিঃ দ্রঃ গাযওয়া হচ্ছে ঐ সব যুদ্ধাভিযান, যেগুলোতে স্বয়ং নাবী কারীম (সাঃ) উপস্থিত ছিলেন । পক্ষান্তরে সারিয়া বলা হয় তাঁর প্রেরিত বাহিনীগুলির অভিযান সমূহকে।

সারিয়্যঃ দীনায় হিজরতের পর মুসলিমদের যে সকল সারিয়্যাহ ভসংঘটিত হয় ।

১। সারিয়্যাতু সীফিল বাহর বা সমুদ্রোপকূলের প্রেরিত বাহিনী[১]

হিজরী ১ম বর্ষ রমাযান মাস মুতাবিক মার্চ ৬২৩ খ্রিষ্টাব্দে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) হামযাহ বিন আবুল মুত্তালিবকে এ অভিযানে সেনাপতি নিযুক্ত করেন এবং তাঁর অধীনে ৩০ জন মুহাজির সৈন্য দিয়ে তাদেরকে সিরিয়া থেকে প্রত্যাবর্তনকারী কুরাইশ কাফেলার গতিবিধি লক্ষ্য করার উদ্দেশ্যে প্রেরণ করেন। তিন শত সদস্য বিশিষ্ট এ কুরাইশ কাফেলার অন্যতম সদস্য ছিল আবূ জাহল। মুসলিম বাহিনী 'ঈস'[2] নামক জায়গার পার্শ্ববর্তী সমুদ্রোপকূলের নিকট পৌঁছলে ঐ কাফেলার সঙ্গে তাঁদের সাক্ষাৎ ঘটে। উভয় দলই পরস্পরের মুখোমুখী হলে এক পর্যায়ে উভয় দলই যুদ্ধ প্রস্তুতি নিয়ে সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে যায়। কিন্তু জুহাইনা গোত্রের নেতা মাজদী ইবনু 'আমর- যিনি উভয় দলেরই মিত্র ছিলেন- অনেক চেষ্টা চরিত্র করে উভয় দলকে যুদ্ধে লিপ্ত হওয়া থেকে নিরস্ত করেন।

হামযাহ (রাঃ)-এর এটা ছিল প্রথম পতাকা যা রাসূলুল্লাহ (ﷺ) স্বীয় মুবারক হাত দ্বারা বেঁধে দিয়েছিলেন। এর বহনকারী ছিলেন আবূ মার্সাদ কিনায ইবনু হাসীন গানাভী (রাঃ)।

২). সারিয়্যাতু রাবিগ বা রাবিগ অভিযানঃ

এ অভিযান পরিচালিত হয় হিজরী ১ম বর্ষের শাওয়াল মাস মুতাবিক এপ্রিল, ৬২৩ খ্রিষ্টাব্দে। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) উবাইদাহ ইবনু হারিস ইবনু মুত্তালিবকে ৬০ জন মুহাজিরের সমন্বয়ে গঠিত এক বাহিনীর নেতৃত্ব দিয়ে প্রেরণ করেন। এ অভিযানে তাঁরা রাবেগ উপত্যকায় আবূ সুফইয়ানের সম্মুখীন পরস্পর পরস্পরের উপর কিছু সংখ্যক তীর নিক্ষেপ করা ছাড়া আর তেমন কিছুই করেনি, যার ফলে বড় আকারের কোন ঘটনা সংঘটিত হয় নি।

এ অভিযান কালে মক্কা বাহিনী থেকে দু'জন মুসলিম এসে যোগদান করেন মুসলিম বাহিনীতে। এদের একজন হচ্ছেন মিক্বদাদ বিন আমরুল বাহরানী এবং অন্যজন হচ্ছেন উতবাহ বিন গাযওয়ান মাযেনী (রাঃ), উভয়েই মুসলিম ছিলেন। তাঁরা কাফিরদের সঙ্গে এ উদ্দেশ্যে বাহির হয়েছিলেন যে, সামনে গিয়ে মুসলিমদের সঙ্গে মিশে যাবেন। আবূ ওবায়দার (রাঃ) পতাকা ছিল সাদা এবং তার বহনকারী ছিলেন মিসতাহ বিন আসাসাহ বিন মুত্তালিব বিন আবদে মানাফ।

৩)সারীয়্যায়ে খার্রারঃ[৩]

এ অভিযান হিজরী ১ম বর্ষের যিলকদ মাস মুতাবিক মে ৬২৩ খ্রিষ্টাব্দে অনুষ্ঠিত হয়।রাসূলুল্লাহ (ﷺ) সা'দ ইবনু আবী ওয়াক্কাস (রাঃ)-কে এ সারিয়্যাহর সেনাপতি নিযুক্ত করেন এবং বিশ জন যোদ্ধার সমন্বয়ে এক বাহিনী গঠন করে একটি কুরাইশ কাফেলার গতিবিধি লক্ষ্য করার উদ্দেশ্যে প্রেরণ করেন। তাদেরকে তিনি সতর্ক করে দিয়ে বলেন যে, তারা যেন খার্রার হতে সামনের দিকে আর অগ্রসর না হন। এ বাহিনী পদব্রজে পথ চলতেন। তারা দিবাভাগে নিজেদের গোপন করে রাখতেন এবং রাতের বেলা পথ চলতেন। পঞ্চম দিবস সকালে তারা খার্রারে গিয়ে পৌঁছেন। কিন্তু সেখানে গিয়ে জানতে পারেন যে, একদিন পুর্বেই সেই কাফেলা সে স্থান অতিক্রম করে গিয়েছে। এ সারিয়্যাহর পতাকা ছিল সাদা রঙের এবং পতাকাবাহী ছিলেন মিক্বদাদ ইবনু 'আমর (রাঃ)।

মদীনায় হিজরতের পর মুসলিমদের যে সকল গায্ওয়ায় অংশ গ্রহণ করতে হয়েছিল

১. গাযওয়ায়ে আবওয়া অথবা অদ্দান[4]

সংঘটিত সময়ঃ এ গাযওয়ার সময় ছিল হিজরী ২য় বর্ষের সফর মাস মুতাবিক আগষ্ট, ৬২৩ খ্রিষ্টাব্দ।

মুসলিম সৈন্য সংখ্যাঃ ৭০ জন মুহাজির যোদ্ধাকে সঙ্গে নিয়ে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) স্বয়ং এ যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেন। এ গাযওয়ায় যাত্রার প্রাক্কালে সা'দ ইবনু উবাদাহ (রাঃ)-কে মদীনায় তার স্থলাভিষিক্ত রূপে নিযুক্ত করা হয়।

তাঁদের এ যাত্রার উদ্দেশ্য ছিল একটি কুরাইশ কাফেলার পথরোধ করা। তাদের অগ্রযাত্রার এক পর্যায়ে তিনি অদ্দানে গিয়ে পৌঁছেন।

কিন্তু সংঘাতমূলক কোন ঘটনা সংঘটিত হয় নি। এ গাযওয়া অভিযান কালেই রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বনু যমরাহ গোত্রের তৎকালীন সরদার 'আমর ইবনু মুখশী যমরীর সঙ্গে মিত্রতামূলক চুক্তি সম্পাদন করেন। চুক্তির কথাগুলো নিম্নরূপঃ

"এটা হচ্ছে বনু যমরাহর জন্য মহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর দলীল। এ গোত্রের লোকজনেরা লাভ করবে তাদের জান ও মালের নিরাপত্তা। তারা আক্রান্ত হলে আক্রমণকারীদের বিরুদ্ধে তাদের সাহায্য করা হবে, যদি তারা আল্লাহর দ্বীনের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত না হয়। পক্ষান্তরে, যখনই রাসূলুল্লাহ (ﷺ) তাঁর সাহায্যের প্রয়োজনে তাদেরকে আহবান জানাবেন তখনই তাঁর সাহায্যার্থে তাদেরকে এগিয়ে আসতে হবে।[5]

"এটা ছিল প্রথম সৈন্য পরিচালনা যাতে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) নিজে অংশ গ্রহণ করেছিলেন। এ অভিযানে ১৫ দিন যাবৎ মদীনার বাইরে থাকার পর তিনি মদীনা ফিরে আসেন। এ অভিযানের পতাকার রঙ ছিল সাদা এবং পতাকাবাহী ছিলেন হামযাহ (রাঃ)।

২. গাযওয়ায়ে বুওয়াত বা বুওয়াতের অভিযানঃ

সংঘটিত সময়ঃএ অভিযান সংঘটিত হয় হিজরী দ্বিতীয় বর্ষের রবিউল আওয়াল মুতাবিক সেপ্টেম্বর, ৬২৩ খ্রিষ্টাব্দে।

মুসলিম সৈন্য সংখ্যাঃদু'শ জন সাহাবী সমভিব্যাহার রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এ অভিযানে বহির্গত হন। এক কুরাইশ কাফেলার পথরোধ করাই ছিল এ অভিযানের উদ্দেশ্য। উমাইয়া ইবনু খালফসহ একশ জন কুরাইশ এবং আড়াই হাজার উট ছিল এ কাফেলায়। মুসলিম বাহিনী রাযওয়ার পার্শ্ববর্তী বুওয়াত[6] নামক স্থান পর্যন্ত পৌঁছেন। কিন্তু কোন সংঘর্ষ বাধেনি। এ গাযওয়ায় গমনকালে সা'দ ইবনু মু'আয (রাঃ)-কে মদীনার আমীর নিযুক্ত করা হয়। এ গাযওয়ার পতাকা ছিল সাদা এবং পতাকাবাহী ছিলেন সা'দ ইবনু আবী ওয়াক্কাস (রাঃ)।

৩. গাযওয়ায়ে সাফওয়ানঃ

সংঘটিত সময়ঃ এ গাযওয়া সংঘটিত হয় হিজরী দ্বিতীয় বর্ষের রবীউল আওয়াল মাস মুতাবিক সেপ্টেম্বর ৬২৩ খ্রিষ্টাব্দে।

এ গাযওয়ার কারণ ছিল কুরয ইবনু জারির ফাহরী মুশরিকদের একটি ক্ষুদ্র বাহিনী নিয়ে মদীনার চারণভূমির উপর আক্রমণ চালায় এবং কিছু গবাদি পশু লুট করে নিয়ে যায়।

মুসলিম সৈন্য সংখ্যাঃরাসূলুল্লাহ (ﷺ) সত্তর জন সাহাবীকে সঙ্গে নিয়ে তাদের পশ্চাদ্ধাবন করেন এবং বদর প্রান্তরের পার্শ্ববর্তী সাফওয়ান উপত্যকায় গিয়ে পৌঁছেন। কিন্তু কুরয এবং তার সঙ্গীরা অত্যন্ত দ্রুতবেগে তাদের নাগালের বাইরে চলে যেতে সক্ষম হয়। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) তাঁর বাহিনীসহ মদীনা প্রত্যাবর্তন করেন। এ গাযওয়ায় শত্রু পক্ষের সঙ্গে সংঘাতে লিপ্ত হওয়ার কোন সুযোগই সৃষ্টি হয় নি। কেউ কেউ এ গাযওয়াকে গাযওয়ায়ে বদরে উলা বা বদরের প্রথম যুদ্ধ বলে অভিহিত করেন।

এ গাযওয়ায় যাওয়ার সময় রাসূলুল্লাহ (ﷺ) যায়দ ইবনু হারিসাহকে মদীনায় আমীর নিযুক্ত করেন। এ গাযওয়ায় পতাকার রঙ ছিল সাদা এবং পতাকাবাহী ছিলেন আলী (রাঃ)।

৪. গাযওয়ায়ে যিল উশাইরাহঃ

সংঘটিত সময়ঃএ গাযওয়া সংঘটিত হয় হিজরী দ্বিতীয় বর্ষের জামাদিউল ঊলা ও জামাদিউল উখরা মুতাবিক নভেম্বর ও ডিসেম্বর ৬২৩ খ্রিষ্টাব্দে।

মুসলিম সৈন্য সংখ্যাঃএ অভিযানে রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর সঙ্গে অংশ গ্রহণ করেন দেড়শ কিংবা দু'শ মুহাজির সাহাবী। অবশ্য এ অভিযানে অংশ গ্রহণ করতে কাউকেই তিনি বাধ্য করেননি। সওয়ারীর জন্য উট ছিল মাত্র ত্রিশটি এ কারণে তারা পালাক্রমে সওয়ার হতেন।

এ অভিযানের উদ্দেশ্য ছিল সিরিয়া অভিমুখে এক কুরাইশ কাফেলার পথরোধ করা। জানা গিয়েছিল যে, এ কাফেলা মক্কা থেকে যাত্রা শুরু করেছে। এ কাফেলার সঙ্গে কুরাইশদের বহু সুন্দর সুন্দর মূল্যবান মালপত্র ছিল। এ কাফেলার সন্ধানে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) তাঁর বাহিনীসহ যুল উশাইরাহ[7] পর্যন্ত অগ্রসর হন। কিন্তু তারা সেখানে পৌঁছার কয়েক দিন পূর্বেই কুরাইশ কাফেলা সে স্থান পরিত্যাগ করে গিয়েছিল। এটা ছিল ঐ যাত্রীদল সিরিয়া থেকে প্রত্যাবর্তনের পথে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) যাদেরকে গ্রেফতার করতে চেয়েছিলেন। ঐ যাত্রীদল তার হাত থেকে রক্ষা পেয়ে ফিরে গিয়েছিলেন বটে, কিন্তু এর ফলে ক্ষেত্র তৈরি হয়েছিল বদর যুদ্ধের। ইবনু ইসহাক্বের বর্ণনা মতে এ অভিযানে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বের হয়েছিলেন জামাদিউল উলার শেষ ভাগে এবং মদীনায় ফিরে এসেছিলেন জামাদিউল উখরায়। সম্ভবতঃ এ কারণেই এ গাযওয়ায় মাস নির্ধারণে নাবী (ﷺ)-এর জীবনী লেখকদের মধ্যে মতভেদ সৃষ্টি হয়েছে। এ গাযওয়া কালে

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বনু মুদলিজ এবং তাদের মিত্র বনু যমরাহর সঙ্গে যুদ্ধ না করার চুক্তি সম্পাদন করেন।

এ অভিযানের দিনগুলোতে আবূ সালামাহ ইবনু আব্দুল আসাদ মাখযুমী (রাঃ) মদীনার শাসন পরিচালনের দায়িত্ব পালন করেন। এবারের পতাকাও ছিল সাদা রঙের এবং পতাকাবাহী ছিলেন হামযাহ (রাঃ)।

৫. নাখলাহ অভিযান :

সংঘটিত সময়ঃএ অভিযানের সময় ছিল হিজরী দ্বিতীয় বর্ষের রজব মাস মুতাবিক জানুয়ারী ৬২৪ খ্রিষ্টাব্দে। মুসলিম সৈন্য সংখ্যাঃএ অভিযানে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) আব্দুল্লাহ ইবনু জাহশ (রাঃ)-এর নেতৃত্বে বারো জন মুহাজির সাহাবীর একটি বাহিনী প্রেরণ করেন। এ বাহিনীর বাহন ছিল প্রতি দুজনের জন্য একটি উট। একই উটের উপর তার পালাযথাক্রমে আরোহণ করতেন। বাহিনী প্রধানের হাতে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) একটি পত্র দিয়ে নির্দেশ প্রদান করেন যে, দু'দিনের পথ অতিক্রম করার পর যেন এ পত্র পাঠ করা হয়। সুতরাং দুদিন পথ চলার পর আব্দুল্লাহ (রাঃ) পত্রটি পাঠ করেন। পত্রে লিখিত ছিল 'আমার এ পত্র পাঠ করার পর তোমরা সামনের দিকে এগিয়ে চলবে এবং মক্কা ও ত্বায়িফের মধ্যস্থানে অবস্থিত নাখলায় অবরতণ করবে। এক কুরাইশ কাফেলার আগমনের প্রতীক্ষায় তোমরা সেখানে ওঁৎ পেতে থাকবে এবং তাদের অবস্থা ও অবস্থান সম্পর্কে আমাদের অবহিত করবে।

রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর এ নির্দেশ পালনের জন্য আব্দুল্লাহ দ্বিধাহীন চিত্তে মানসিক প্রস্তুতি নেয়ার পর তাঁর সঙ্গীদের নিকটে পত্রের বিষয়টি প্রকাশ করে বললেন, 'আমি কারো উপর জোর জবরদস্তি করতে চাই না। তোমাদের মধ্যে যার শাহাদাত পছন্দনীয় নয় সে প্রত্যাবর্তন করবে। শাহাদাতই আমার কাম্য।'

তাঁর এ কথা শ্রবণের পর সঙ্গীরা সকলেই সম্মুখ পানে অগ্রসর হতে থাকলেন। কিছু পথ অতিক্রম করার পর সা'দ ইবনু আবী ওয়াক্কাস (রাঃ) এবং 'উতবাহ ইবনু গাযওয়ানের উটটি হারিয়ে যায়। এ উটটিই ছিল তাঁদের উভয়ের বাহন। উট হারিয়ে যাওয়ার কারণে তাঁরা পিছনে থেকে যেতে বাধ্য হন।

আব্দুল্লাহ ইবনু জাহশ (রাঃ) এবং তার সঙ্গীগণ দীর্ঘপথ অতিক্রম করার পর নাখলায় অবতরণ করেন। সেই সময় একটি কুরাইশ বাণিজ্য কাফেলা সেই পথ দিয়ে যাচ্ছিল। তাদের বাণিজ্য সামগ্রী ছিল কিশমিশ, চামড়া এবং আরও অনেক সামগ্রী। ঐ কাফেলায় ছিল আব্দুল্লাহ ইবনু মুগীরার দু'পুত্র উসমান ও নওফাল এবং মুগীরার মুক্ত দাস 'আমর ইবনু হাযরামী ও হাকীম ইবনু কায়সান। শত্রুপক্ষ নাগালের মধ্যে, অথচ দিনটি ছিল হারাম মাস রজবের শেষ দিন। এ দিনে মুসলিম বাহিনীর মনে কিছুটা দ্বিধা-দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে তাঁরা পরস্পর পরামর্শ করতে থাকলেন। যদি তারা এ দিনে যুদ্ধে লিপ্ত হন তাহলে হারাম মাসের অসম্মান

করা হবে। পক্ষান্তরে রাত্রি পর্যন্ত যুদ্ধে লিপ্ত হওয়া থেকে বিরত থাকলে ঐ কাফেলা আরও অগ্রসর হয়ে হারাম সীমার মধ্যে প্রবেশ করবে। উভয় সংকট জনিত দ্বিধা-দ্বন্দ্বের অবসান ঘটিয়ে মুসলিম বাহিনী অবশেষে এ কুরাইশ কাফেলাকে আক্রমণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন। আক্রমণের সূচনাতে মুসলিম বাহিনী 'আমর ইবনু হাযরামীকে লক্ষ্য করে তীর নিক্ষেপ করলেন। তীরবিদ্ধ হাযরামী ঢলে পড়ল মৃত্যুর কোলে। তারপর তারা উসমান এবং হাকীমকে বন্দী করে ফেললেন। কিন্তু পলায়নপর নওফাল নাগালের বাইরে গিয়ে আত্মরক্ষা করতে সক্ষম হল। বন্দী দুজন এবং মালপত্রসহ মুসলিম বাহিনী নিরাপদে মদীনায় প্রত্যাবর্তন করলেন। তারা গণীমতের মাল হতে এক পঞ্চামাংশ বের করেও নিয়েছিলেন।[৪]

হারাম মাসে মুসলিম বাহিনীর যুদ্ধে লিপ্ত হওয়ার ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) অসন্তোষ প্রকাশ করে বলেন, 'আমি তো তোমাদেরকে হারাম মাসে যুদ্ধ করার হুকুম দেই নি।' এ অভিযানের গণীমত এবং যুদ্ধবন্দীদের ব্যাপারে তিনি কোন প্রকার হস্তক্ষেপ করেননি।

সারিয়্যাতু নাখলার ঘটনার ফলে মুশরিকেরা এ রটনা রটানোর সুযোগ পায় যে, মুসলিমগণ আল্লাহ তা'আলার হারামকৃত মাসে যুদ্ধ এবং নরহত্যা করে 'হারাম' বিধান লঙ্ঘন করেছে এবং তার অমর্যাদা করেছে। এর ফলে দারুণ অস্বস্তিকর অবস্থার সৃষ্টি হয়ে যায়। শেষ পর্যন্ত আল্লাহ তা'আলা ওহী নাযিল করে এ সমস্যার সমাধান করে দেন। ওহীর মাধ্যমে তিনি ঘোষণা করেন যে, মুশরিকেরা যে সকল কাজকর্ম করেছে তা মুসলিমদের এ কাজের তুলনায় বহুগুণে অপরাধজনক। কালাম পাকে - হয়েছেঃ

(يَسْأَلُوْنَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيْهِ قُلْ قِتَالٌ فِيْهِ كَبِيْرٌ وَصَدٌّ عَن سَبِيْلِ اللهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِندَ اللهِ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ) [البقرة: 217].

" পবিত্র মাসে লড়াই করা সম্বন্ধে তোমাকে তারা জিজ্ঞেস করছে। বল, এতে যুদ্ধ করা ভয়ঙ্কর গুনাহ। পক্ষান্তরে আল্লাহর পথ হতে বাধা দান, আল্লাহর সঙ্গে কুফুরী, কা'বা গৃহে যেতে বাধা দেয়া এবং তাথেকে তার বাসিন্দাদেরকে বের করে দেয়া আল্লাহর নিকট তার চেয়ে অধিক অন্যায়। ফিতনা হত্যা হতেও গুরুতর অন্যায়।' (আল-বাক্বারাহ ২ : ২১৭)

এ ওহী নাযিল হওয়ার ফলে এটা সুস্পষ্ট হয়ে গেল যে, মুসলিম মুজাহিদের সম্পর্কে মুশরিকেরা যে অপবাদ রটাচ্ছে তা হচ্ছে সম্পূর্ণ অমূলক ও ভিত্তিহীন। কেননা, কুরাইশ মুশরিকগণ ইসলাম ও মুসলিমদের বিরুদ্ধে অন্যায় অনাচার ও জুলুম নির্যাতন করার ব্যাপারে বিন্দুমাত্রও ইতস্তত করে নি কিংবা নিয়ম নীতির প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করে নি। যখন হিজরতকারী মুসলিমদের ধনমাল তারা ছিনিয়ে নেয়ার কাজে ব্যাপৃত থাকত এবং এমন কি রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে হত্যার জন্য তারা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিল তখন হারাম মাস কিংবা হারাম সীমার (মক্কা) প্রতি তারা কোন ভ্রুক্ষেপই করেনি। অথচ, কী কারণে হঠাৎ করে তারা এ পবিত্র মাসগুলোর পবিত্রতার ব্যাপারে এত সচেতন হয়ে উঠল এবং এগুলোর পবিত্রতা নষ্ট করা দূষণীয় বলে এত সোচ্চার

হয়ে উঠল? অবশ্যই মুসলিমদের বিরুদ্ধে মুশরিকেরা যে গুজব রটিয়েছে এবং হৈ চৈ শুরু করেছে তা প্রকাশ্য বিদ্বেষ ও সুস্পষ্ট নির্লজ্জতার উপর প্রতিষ্ঠিত।

এরপর রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বন্দী দুজনকে মুক্ত করে দেন এবং নিহত ব্যক্তিটির অভিভাবককে রক্তপণ দেয়ার ব্যবস্থা করেন।[9]

এগুলো হচ্ছে বদর যুদ্ধের পূর্বেকার সারিয়্যাহ ও গাযওয়া। এগুলোর কোনটাতেই সুস্পষ্ট ও হত্যার তেমন কোন ঘটনা ঘটেনি, যে পর্যন্ত না কুরয ইবনু জাবির ফাহরীর নেতৃত্বে মুশরিকরা মদীনার সন্নিকটস্থ চারণ ভূমি থেকে কিছু গবাদি পশু লুট করে নিয়ে যায়। সুতরাং বুঝা গেল যে, এর সূচনাও মুশরিকদের পক্ষ থেকেই হয়েছিল। ইতোপূর্বে তারা যেমন বিভিন্ন প্রকার অত্যাচার ও উৎপীড়ন চালিয়ে এসেছিল, গবাদি পশু লুট কারার ঘটনাটিও ছিল অনুরূপ একটি ঘটনা।

আব্দুল্লাহ ইবনু জাহশের সারিয়্যার পর কুরাইশ মুশরিকদের মধ্যে কিছুটা ভয়-ভীতির ভাব পরিলক্ষিত হল এবং তারা সুস্পষ্টভাবে এটা উপলব্ধি করল যে, তাদের সামনে এক ভয়াবহ বিপদের সম্ভাবনা ক্রমেই দানা বেঁধে উঠছে। যে ফাঁদে পড়ার আশঙ্কা তারা এতদিন করে আসছিল শেষ পর্যন্ত সেই ফাঁদেই তাদের পতিত হতে হল। এ বিষয়টিও তাদের নিকট পরিষ্কার হয়ে গেল যে, মদীনার মুসলিম বাহিনী অত্যন্ত সজাগ ও তৎপর রয়েছে এবং কুরাইশদের প্রত্যেকটি বাণিজ্য কাফেলার গতিবিধির উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রেখে চলছে। তারা এটাও বুঝল যে, মুসলিমগণ এখন ইচ্ছা করলে তিনশ মাইল পথ অতিক্রম করে আক্রমণ চালাতে, লোকজনদের বন্দী করে নিয়ে নিরাপদে প্রত্যাবর্তন করতে সম্পূর্ণ সক্ষম। এটাও তাদের নিকট সুস্পষ্ট হয়ে গেল যে, সিরিয়ামুখী ব্যবসা-বাণিজ্য এখন কঠিন বিপদের সম্মুখীন। কিন্তু তা সত্ত্বেও তারা নিজেদের মূর্খতা এবং উদ্ধত আচরণ থেকে বিরত রইল না। তারা জুহাইনা এবং বনু যমরাহ গোত্রদ্বয়ের মতো সন্ধির পথ অবলম্বনের পরিবর্তে ক্রোধ, হিংসা ও শত্রুতার মাত্রা আরো বাড়িয়ে দিল। তাদের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরাও সিদ্ধান্ত নিয়ে গেল যে, মুসলিমদের আবাসস্থানে আক্রমণ চালিয়ে তারা তাদের একদম নিশ্চিহ্ন করে ফেলবে। এ লক্ষ্যে এক সুসজ্জিত যোদ্ধা বাহিনীসহ তারা বদর প্রান্তর অভিমুখে অগ্রসর হল।

এখন মুসলিমদের সম্পর্কে বলতে গেলে বলতে হয় যে, আব্দুল্লাহ ইবনু জাহশের সারিয়্যার পর দ্বিতীয় হিজরী সনে শা‘বান মাসে আল্লাহ তা‘আলা তাদের উপর যুদ্ধ ফরজ করে দেন এবং এ সম্পর্কীয় কয়েকটি সুস্পষ্ট আয়াত অবতীর্ণ করেন। ইরশাদ হলোঃ

(وَقَاتِلُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللهِ الَّذِيْنَ يُقَاتِلُوْنَكُمْ وَلاَ تَعْتَدُوْا إِنَّ اللهَ لاَ يُحِبِّ الْمُعْتَدِيْنَ وَاقْتُلُوْهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوْهُمْ وَأَخْرِجُوْهُم مِّنْ حَيْثُ أَخْرَجُوْكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَلاَ تُقَاتِلُوْهُمْ عِندَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوْكُمْ فِيْهِ فَإِن قَاتَلُوْكُمْ فَاقْتُلُوْهُمْ كَذٰلِكَ جَزَاء الْكَافِرِيْنَ فَإِنِ انتَهَوْاْ فَإِنَّ اللهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ وَقَاتِلُوْهُمْ حَتَّى لاَ تَكُوْنَ فِتْنَةٌ وَيَكُوْنَ الدِّيْنُ لِلهِ فَإِنِ انتَهَواْ فَلاَ عُدْوَانَ إِلاَّ عَلَى الظَّالِمِيْنَ)

[البقرة:190- 193]

''তোমরা আল্লাহর পথে সেই লোকেদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর, যারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে, কিন্তু সীমা অতিক্রম করো না। আল্লাহ নিশ্চয়ই সীমা অতিক্রমকারীকে ভালবাসেন না। **১৯১.** তাদেরকে যেখানেই পাও হত্যা কর এবং তাদেরকে বের করে দাও যেখান থেকে তারা তোমাদেরকে বের করে দিয়েছে। বস্তুতঃ ফিতনা হত্যার চেয়েও গুরুতর। তোমরা মাসজিদে হারামের নিকট তাদের সাথে যুদ্ধ করো না, যে পর্যন্ত তারা তোমাদের সাথে সেখানে যুদ্ধ না করে, কিন্তু যদি তারা তোমাদের সাথে যুদ্ধ করে, তবে তোমরাও তাদের হত্যা কর, এটাই কাফিরদের প্রতিদান। **১৯২.** তারপর যদি তারা বিরত হয়, তবে আল্লাহ ক্ষমাশীল, বড়ই দয়ালু। **১৯৩.** ফিত্না দূরীভূত না হওয়া পর্যন্ত এবং দীন আল্লাহর জন্য নির্ধারিত না হওয়া পর্যন্ত তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর, তারপর যদি তারা বিরত হয় তবে যালিমদের উপরে ছাড়া কোনও প্রকারের কঠোরতা অবলম্বন জায়িয হবে না।' (আল-বাক্বারাহ ২ : ১৯০-১৯৩)

এরপর অতি সত্বরই অন্য প্রকারের আয়াত অবতীর্ণ হলো যাতে যুদ্ধের নিয়ম কানুন বর্ণিত হলো। ইরশাদ হলোঃ

(فَإِذا لَقِيْتُمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّى إِذَا أَثْخَنتُمُوْهُمْ فَشُدُّوْا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاء حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا ذَٰلِكَ وَلَوْ يَشَاء اللهُ لَانتَصَرَ مِنْهُمْ وَلَكِن لِّيَبْلُوَ بَعْضَكُم بِبَعْضٍ وَالَّذِيْنَ قُتِلُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللهِ فَلَن يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ سَيَهْدِيْهِمْ وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا إِن تَنصُرُوْا اللهَ يَنصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ) [محمد: 4- 7]

''তারপর যখন তোমরা কাফিরদের সঙ্গে যুদ্ধে অবতীর্ণ হও, তখন তাদের ঘাড়ে আঘাত হানো, অবশেষে যখন তাদেরকে পূর্ণরূপে পরাস্ত কর, তখন তাদেরকে শক্তভাবে বেঁধে ফেল। তারপর হয় তাদের প্রতি অনুগ্রহ কর, না হয় তাদের থেকে মুক্তিপণ গ্রহণ কর। তোমরা যুদ্ধ চালিয়ে যাবে, যে পর্যন্ত না শত্রুপক্ষ অস্ত্র সমর্পণ করে। এ নির্দেশই তোমাদেরকে দেয়া হল। আল্লাহ ইচ্ছে করলে (নিজেই) তাদের উপর প্রতিশোধ নিতে পারতেন। কিন্তু তিনি তোমাদের একজনকে অন্যের দ্বারা পরীক্ষা করতে চান (এজন্য তোমাদেরকে যুদ্ধ করার সুযোগ দেন)। যারা আল্লাহর পথে শহীদ হয় তিনি তাদের কর্মফল কক্ষনো বিনষ্ট করবেন না। ৫. তিনি তাদেরকে সঠিক পথে পরিচালিত করেন আর তাদের অবস্থা ভাল করে দেন। ৬. তারপর তিনি তাদেরকে জান্নাতে দাখিল করবেন যা তাদেরকে তিনি জানিয়ে দিয়েছেন। ৭. হে ঈমানদারগণ! তোমরা যদি আল্লাহকে সাহায্য কর, তিনি তোমাদেরকে সাহায্য করবেন আর তোমাদের পদগুলোকে দৃঢ়প্রতিষ্ঠ করবেন।' (মুহাম্মাদ ৪৭ : ৪-৭)

এরপর আল্লাহ তা'আলা ঐ সকল লোকদের নিন্দা করেছেন যুদ্ধের হুকুম শুনে যাদের হৃৎকম্পন শুরু হয়েছিল। ইরশাদ হলোঃ

(فَإِذَا أُنزِلَتْ سُوْرَةٌ مُّحْكَمَةٌ وَذُكِرَ فِيْهَا الْقِتَالُ رَأَيْتَ الَّذِيْنَ فِيْ قُلُوْبِهِم مَّرَضٌ يَنظُرُوْنَ إِلَيْكَ نَظَرَ الْمَغْشِيِّ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ) [محمد: 20]

‘‘তারপর যখন কোন সুস্পষ্ট অর্থবোধক সূরাহ্ অবতীর্ণ হয় আর তাতে যুদ্ধের কথা উল্লেখ থাকে, তখন যাদের অন্তরে রোগ আছে তুমি তাদেরকে দেখবে মৃত্যুর ভয়ে জ্ঞানহারা লোকের মত তোমার দিকে তাকাচ্ছে। কাজেই ধ্বংস তাদের জন্য।’ (মুহাম্মাদ ৪৭ : ৪-৭)

বস্তুতঃ যুদ্ধ ফরজ করা, তার প্রতি উৎসাহ দান করা এবং তার প্রস্তুতির নির্দেশ প্রদান ছিল পরিস্থিতির প্রয়োজন। এমন কি পরিস্থিতির প্রতি সতর্ক ও তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপনরত কোন সেনাধিনায়ক থাকলে তিনিও তাঁর সেনাবাহিনীকে সর্ব প্রকারের সংঘাতময় পরিস্থিতির তাৎক্ষণিক মোকাবেলা করার জন্য প্রস্তুত থাকার নির্দেশ প্রদান করতেন। তাহলে মহামহিমান্বিত আল্লাহ যিনি প্রকাশ্য ও গোপনীয় সকল বিষয় সম্পর্কে পূর্ণ ওয়াকেবহাল তিনি কেন এরূপ নির্দেশ প্রদান করবেন না? প্রকৃত ব্যাপার হচ্ছে প্রয়োজন ও পরিস্থিতির একান্ত আকাঙ্ক্ষিত ছিল ‘হক’ ও ‘বাতিলের’ মধ্যে একটি রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের বিশেষ করে আব্দুল্লাহ ইবনু জাহশের অভিযান পরবর্তী পরিস্থিতির যা মুশরিকদের মর্যাদা ও আমিত্বের উপর ছিল কঠিন আঘাত স্বরূপ এবং যা তাদেরকে যন্ত্রণায় ফেলে রেখেছিল।

যুদ্ধের নির্দেশ সম্পর্কিত পূর্বাপর আয়াতগুলো দ্বারা অনুমিত হচ্ছিল যে, রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের সময় আসন্ন প্রায় এবং এতে মুসলিমদের বিজয়ও সুনিশ্চিত। এটা বিশেষ লক্ষণীয় বিষয় যে, কিভাবে আল্লাহ তা‘আলা মুসলিমদের নির্দেশ দিচ্ছেন, ‘যেখান থেকে মুশরিকরা তোমাদের বের করে দিয়েছে তোমরাও তাদেরকে সেখান থেকে বের করে দাও।’ আর কিভাবে তিনি বন্দীদেরকে বেঁধে ফেলার এবং বিরোধীদেরকে পিষ্ট করে যুদ্ধের পরিসমাপ্তি ঘটানোর হিদায়াত দিয়েছেন যা একটি বিজয় কাহিনীর সাথে সম্পর্কযুক্ত। এর মাধ্যমে সুস্পষ্ট ইঙ্গিত হচ্ছিল যে, মুসলিমদের বিজয় সুনিশ্চিত।

কিন্তু এটা গোপনীয়তার সঙ্গে এবং আভাষ ইঙ্গিতেই বলা হয়েছে যাতে যে ব্যক্তি আল্লাহর পথে যুদ্ধের জন্য যতটা আগ্রহী ও উন্মুখ থাকে কার্যতঃ তা প্রকাশ করতে সক্ষম হয়।

তারপর ঐ সময়েই অর্থাৎ দ্বিতীয় হিজরীর শা‘বান মাস মুতাবিক ৬২৪ খ্রিষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে আল্লাহ তা‘আলা বায়তুল মুকাদ্দাসের পরিবর্তে ক্বাবা’হ গৃহকে ক্বিবলাহ বলে ঘোষণা করলেন এবং নামাযে ঐ দিক মুখ ফিরানোর নির্দেশ প্রদান করলেন। এর ফলে যে ক্ষেত্রে মুসলিমগণ বিশেষভাবে উপকৃত হলেন তা হচ্ছে, যে সকল মুনাফিক্ব ইহুদী মুসলিমদের মধ্যে শুধু ফাটল ধরানো ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে মুসলিমদের সারিতে এসে দাঁড়াত তাদের মুখোশ খুলে গেল। তারা এখন মুসলিমদের মধ্যে থেকে পৃথক হয়ে গিয়ে নিজেদের আসল অবস্থানে ফিরে গেল। আর এভাবে মুসলিমদের সারিগুলো বিশ্বাসঘাতক ও কপটদের বিশ্বাসঘাতকতা ও কপটতার দূষণ থেকে পবিত্র হয়ে গেল।

এ সময় ক্বিবলাহ পরিবর্তনের মধ্যে যে একটি সূক্ষ্ম ইঙ্গিত নিহিত ছিল তা হচ্ছে এখন থেকে এমন একটি নতুন যুগের সূচনা হতে যাচ্ছে যা এ ক্বিবলাহর উপর মুসলিমদের অধিকার প্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে। কেননা, এটা বড়ই বিস্ময়কর এবং কথা হবে যে, কোন জাতির ক্বিবলাহ তাদের শত্রুদের কব্জায় থাকবে। আর যদি তা সেভাবে থাকে তাহলে

এটা খুবই জরুরী যে, তাদের শত্রুদের অধিকার থেকে মুক্ত করে সেখানে নিজেদের অধিকার প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। এ নির্দেশাবলী ও ইঙ্গিতসমূহ প্রকাশের পর মুসলিমদের আনন্দানুভূতি ও আবেগ আরও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হল এবং আল্লাহর পথে তাঁদের যুদ্ধ করার উন্মাদনা এবং শত্রুদের সঙ্গে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তমূলক সংঘর্ষে লিপ্ত হওয়ার আকাঙ্ক্ষা বহুগুণে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হল।

রেফারেন্সঃ বইঃ- আর রাহিকুল মাখতুম ।

[1] সীনে জের দিয়ে পড়া হয়েছে যার অর্থ সমুদ্রোপকূল।

[2] আইন এ জের দিয়ে পড়তে হবে। এটা লোহিত সাগর এলাকার ইয়ামবু এবং মারওয়ার মধ্যস্থলে অবস্থিত একটি জায়গা।

[3] খার্রার যোহফার নিকটবর্তী একটি স্থানের নাম।

[4] অদ্দান হচ্ছে মক্কা ও মদীনার মধ্যস্থলে অবস্থিত একটি জায়গার নাম। এটা রাবেগ হতে মদীনা যাওয়ার পথে ২৯ মাইল দূরত্বে অবস্থিত। আবওয়া হচ্ছে অদ্দানেরই নিকটবর্তী একটি জায়গার নাম।

[5] আল মাওাহিবর লাদুন্নিয়্যাহ ১ম খন্ড ৭৫ পৃঃ যুরকানীর শারহসহ।

[6] বুওয়াত ও রাযওয়া জুহাইনার পাহাড়গুলোর মধ্যে দুটি পাহাড় যা প্রকৃতপক্ষে একটি পাহাড়েরই দুটি শাখা। এটা মক্কা হতে সিরিয়া যাওয়ার পথের সাথে মিলিত হয়েছে। এ পাহাড় দুটি মদীনা থেকে ৪৮ মাইল দূরত্বে অবস্থিত।

[7] উশাইরাহ ইয়ামবুর পার্শ্ববর্তী একটি স্থানের নাম। উশায়বাহকে উশায়রাহ অথবা উসাইরাহ বলা হয়।

[8] চরিতকারগণের বর্ণনা হচ্ছে এটাই, তবে যাতে জটিলতা রয়েছে এবং তা হচ্ছে এক পঞ্চমাংশ বের করে নেয়ার নির্দেশ সংক্রান্ত আয়াত বদর যুদ্ধের পরে অবতীর্ণ হয়েছিল। আর এর শানে নযুলের যে ব্যাখ্যা তাফসীর কিতাবসমূহে দেয়া হয়েছে তাতে জানা যায় যে, এর আগ পর্যন্ত মুসলিমগণ পঞ্চমাংশের হুকম সম্পর্কে অজ্ঞাত ছিলেন।

[9] ঐ সকল সারিয়্যাহ এবং গাযওয়ার বিস্তারিত নিম্নলিখিত পুস্তকাদি থেকে গৃহীত হয়েছে , যা'দুল মা'দ ২য় খন্ড ৮৩-৮৫ পৃঃ ইবনে হিশাম ১ম খন্ড ৫৯১-৬০৫ পৃঃ, রাহমাতুল্লিল আলামীন ১/১১৫-১১৬ পৃঃ, ২য় খন্ড ২১৫-২১৬ ও ৪৬৮ থেকে ৪৭০ পৃঃ। এ গাযওয়া এবং সারিয়্যাহ সম্পর্কে যেখান থেকে তথ্যাদি গৃহীত হয়েছে তার ধারাবাহিকতা এবং তাতে অংশগ্রহণকারীদের সংখ্যা সম্পর্কে মতভেদ রয়েছে। আমি আল্লামা ইবনুল কাইয়্যেম এবং আল্লামা মানসুরপুরীর গৃহীত তথ্যের উপর নির্ভর করেছি।

গবেষণা পদ্ধতিঃ

কুরআন, হাদিস,অধ্যায়ন প্রাসঙ্গিক বই নির্ভরযোগ্য স্কলারদের লেখা প্রতিবেদন, লেকচার, উইকিপিডিয়া হতে আহরন করা সমন্বিত জ্ঞান ও নিজের চিন্তা চেতনা এবং অনুধাবনের সংমিশ্রণে তৈরি।

ফলাফলঃ

উপরে উল্লেখিত বিস্তারিত আলোচনা পর্যালোচনা করলে আমরা দেখতে পাই যে ''জিহাদ:ইসলাম এবং আধুনিক ভুল ধারনা'' এই বিষয়ক গবেষণার/ থিসিসের তথ্যের মাধ্যমে উঠে এসেছে জিহাদ ও ইসলাম সম্পর্কে আধুনিক ভুলধারনা গুলো এবং তা খুব সুন্দরভাবে সঠিক তথ্য উপাত্তের সাহায্যে যৌক্তিক উপায় সে ভুলধারনা গুলো নিরসন করা হয়েছে।
তাই আশা করা যায় এই গবেষণা পত্র/ থিসিস পেপারটি উক্ত নির্দিষ্ট বিষয় সঠিক তথ্য সংবলিত একটি কাজ । যা ''জিহাদ:ইসলাম এবং আধুনিক ভুল ধারনা'' সম্পর্কে জানতে সকলের জন্য সহায়ক হবে।

উপসংহারঃ

উপরের গবেষণাকৃত তথ্য ও ফলাফলগুলির ভিত্তিতে আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি যে এই গবেষণা/ থিসিসে লেখার উদ্দেশ্য "জিহাদ:ইসলাম এবং আধুনিক ভুল ধারণা" দূরীকরণ এবং এ বিষয়ে পরিস্কার ধারনা তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। যাতে করে বর্তমান প্রজন্ম ও ভবিষ্যৎ প্রজন্ম। ইসলামের জিহাদের আসল পরিচয় এবং কথিত আধুনিক সভ্য সমাজে ইসলাম বিদ্বেষী এজেন্ডদের দ্বারা তৈরি করা ভ্রান্ত অযৌক্তিক মতবাদ গুলো কি কি এবং তার বিপক্ষে কুরআন ,হাদিস ও উলামায়ে কেরাম এর লেখনি, বক্তব্য এবং ইতিহাস,বর্তমানের আলোকে যৌক্তিক আলোচনা।এছাড়াও, গবেষণার প্রস্তাবিত তথ্য সম্ভার ভবিষ্যৎ গবেষণার দিকনির্দেশনা হিসেবেও অবদান রাখবে বলে আমি আশা করি ।

রেফারেন্সঃ

গবেষণা পত্র/ থিসিস পেপারেটি তৈরি করতে যে সকল উৎস হতে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে তা নিম্নে উল্লেখ করা হলঃ

- বই
- -কিতাবুল জিহাদ।
- -আয়াতুল কিতাব।

- -আর-রাহিকুল মাখতুম।

- প্রতিবেদন লেখক/ বক্তা ।
- শায়েখ আহমাদুল্লাহ ।
- মুফতি তাজুল ইসলাম।
- ড. মুহাম্মদ ইবনে আবদুর রহমান আরিফী।
- বিল্লাল শেখ।

- অনলাইন ওয়েব সাইট।
- https://ihadis.com/
- https://www.hadithbd.com/quran/tafsir/
- মাশিক আল কাউসার পত্রিকা।
- অনলাইন উকিপিডিয়া, মুক্ত বিশ্ব কোষ।